দক্ষিণ/দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী এবং ধর্ম বা বিশ্বাসের স্বাধীনতা

SEA-AIR Project

Funded by the European Union

WORLD FAITHS DEVELOPMENT DIALOGUE

The Network for Religious and Traditional Peacemakers

এই পলিসি সংক্ষেপটি হচ্ছে পাঁচটি পলিসি সংক্ষেপের একটি যেটি ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন দ্বারা অর্থায়িত *দক্ষিণপূর্ব এশিয়াঃ আন্তধর্মীয় সংলাপ এবং ধর্ম অথবা বিশ্বাসের স্বাধীনতা (এসইএ-এআইআর)* প্রকল্পের অংশ হিসেবে তৈরি করা হয়েছে। এসইএ-এআইআর প্রকল্পটি এসইএ-এআইআর অংশীদারগণ, বিশেষকরে ইন্টারফেইথ ফেলোস দের অবদানসহ আরও যেসব প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় বাস্তবায়িত হয়েছে তারা হল, দ্য নেটওয়ার্ক ফর রিলিজিয়াস অ্যান্ড ট্র্যাডিশনাল পীসমেকারস, ফিন চার্চ এইড, সাথিরাকোসেস নাগাপ্রদীপা ফাউন্ডেশন, ইসলামিক রিলিফ ওয়ার্ল্ডওয়াইড, ওয়ার্ল্ড কনফারেন্স ফর রিলিজয়নস ফর পীস ইনকরপোরেশন, এবং ওয়ার্ল্ড ফেইথস ডেভেলপমেন্ট ডায়ালগ- যারা এই নীতিমালার সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রস্তুতে নেতৃস্থানীয় ছিলেন।

এই প্রকাশনাটি ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের আর্থিক সহযোগিতায় তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু এর বিষয়বস্তু সম্পূর্ণরূপে ওয়ার্ড ফেইথস ডেভেলপমেন্ট ডায়ালগ এবং দ্য নেটওয়ার্ক ফর রিলিজিয়াস অ্যান্ড ট্র্যাডিশনাল পীসমেকারস এর নিজস্ব, এবং এমন নয় যে এটি ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের মতামত প্রতিফলিত করে।

দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় মানবাধিকার রক্ষা ও শান্তিপ্রতিষ্ঠা উভয়ক্ষেত্রেই ধর্মীয় সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠীর মাঝে বিদ্যমান দ্বন্দ এবং চ্যালেঞ্জসমূহের দিকে সাধারণত বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়ে থাকে। এই সংক্ষিপ্ত বিবরণীটি যেসব সংঘাতপূর্ণ বিভাজনরেখা শুধুমাত্র ধর্মীয় পরিচয়ের কারণে নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর প্রতি বৈষম্য ঘটায় কিংবা প্রান্তিক জনগোষ্ঠী হিসেবে তাদের পরিগণিত করে সেই বিষয়গুলোর প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে। এই বিবরণীতে কিছু নির্দিষ্ট দেশের ঘটনাসমূহ খতিয়ে দেখা হয়েছে এবং কিছু সুপারিশ করা হয়েছে যা কিনা নীতিনির্ধারকগণ, মানবাধিকার কর্মী, এবং শান্তিপ্রতিষ্ঠা কর্মীদেরকে জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে অগ্রাধিকার তৈরি ও অর্থবহ কর্মকাণ্ড শুরু করতে সাহায্য করতে পারে।

সংখ্যালঘুদের অধিকার সংরক্ষণ এবং তার প্রসার ঘটানো অনেক দশক ধরেই উন্নয়ন ও মানবাধিকার সম্পর্কিত কর্মকাণ্ডের সূচি হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে। ঠিক কেন একটি জনগোষ্ঠীকে সংখ্যালঘু বলা হবে সেই সংজ্ঞা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ রয়েছে। তবে একই রাষ্ট্রের সীমার মধ্যে কিছু জনগোষ্ঠীকে পরিষ্কারভাবেই তাদের ধর্মবিশ্বাস, নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, ভাষাগত পরিচয়য়, এবং/বা জাতিগত পরিচয়ের ভিত্তিতে বৈষম্যের লক্ষ্যবস্তু করা হয়। ধর্মবিশ্বাস পালনের কিংবা না পালনের অধিকার একটি মৌলিক মানবাধিকার। ধর্ম ও বিশ্বাসের স্বাধীনতা নিবিড়ভাবে অন্যান্য কিছু মানবাধিকারের সাথে জড়িত যেমন, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, সংঘ তৈরি ও জমায়েতের স্বাধীনতা। একইভাবে, কোনও ধর্মবিশ্বাসের অংশ না হওয়াটাও একটি মানবাধিকার। এই অধিকার সংরক্ষণের ক্ষেত্রে একটি আধুনিক রাষ্ট্র বাধ্য।

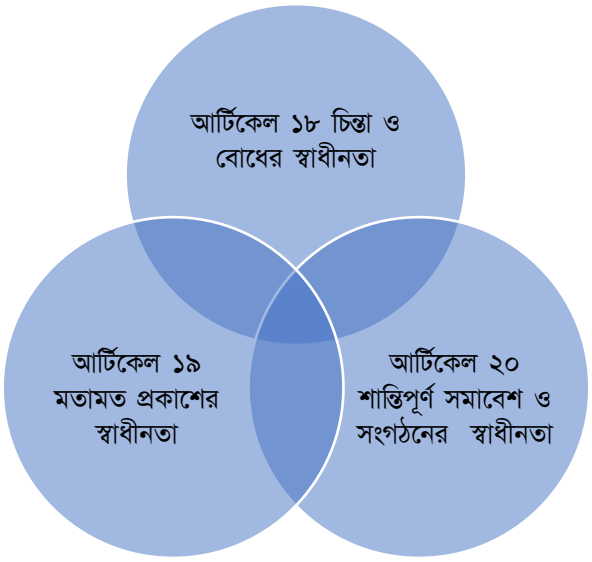

চিত্র ১ মৌলিক মানবাধিকারসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক যা কিনা ধর্মবিশ্বাসের স্বাধীনতারও একটা অংশ (ভেনচিত্র)[1]

আন্তর্জাতিকভাবে সর্বজনস্বীকৃত এমন কোনও সংজ্ঞা নেই যা একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীকে সংখ্যালঘু বা সংখ্যাগুরু হিসেবে চিহ্নিত করে। সংখ্যালঘু এবং সংখ্যাগুরুর এই দ্বিবিভাজন বোঝার চেষ্টা অপেক্ষাকৃত নতুন এবং এটি নিয়ে আন্তর্জাতিক আইন ও উন্নয়নপত্রে সক্রিয়ভাবে বিতর্ক করা হয়। [2] দ্য ইউনাইটেড নেশনস হিউম্যান রাইটস অফিস অফ হাই কমিশনার এর বিবৃতি মতে, সুপ্রতিষ্ঠিত সংজ্ঞা নিয়ে এত বিতর্কের কারণ বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রেক্ষাপটঃ "যেমন অনেক রকম পরিস্থিতি রয়েছে যে সংখ্যালঘুরা কীভাবে বসবাস করেন তার উপর ভিত্তি করে। কোনও ক্ষেত্রে তারা নির্দিষ্ট একটি অঞ্চলে একত্রে বসবাস করেন, আবার কোনও ক্ষেত্রে তারা পুরো

[1] সূত্র: পুনরুৎপাদিত "প্রটেকশান অ্যান্ড প্রমোশন অফ দ্যা রাইটস অ্যান্ড ফ্রিডমস অফ পার্সনস বিলংগিং টু রিলিজিয়াস মাইনরিটিজ" বাই নরওয়েজিয়ান মিনিস্ট্রি অফ ফরেইন অ্যাফেইয়ারস। নেওয়া হয়েছে,

https://www.regjeringen.no/contentassets/b7384abb48db487885e216bf53d30a3c/guidelines_minorities.pdf

[2] ইউনাইটেড নেশনস, অ্যান্ড ইউনাইটেড নেশনস, ইডিএস। প্রমোটিং অ্যান্ড প্রটেক্টিং মাইনরিটি রাইটসঃ আ গাইড ফর অ্যাডভোকেটস। জেনেভাঃ ইউনাইটেড নেশনস।, ২০১২।

দেশেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। কিছু সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর নিজেদের মধ্যে দৃঢ় সামষ্টিক চেতনা ও ইতিহাস সচেতনতা আছে, আবার অনেক ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে গোষ্ঠীগত ঐতিহ্যের চেতনা খুবই ক্ষীণ।"[3] এই সমস্যার মোকাবিলা করতে হলে কোনও গোষ্ঠীকে সংখ্যাগুরু বা সংখ্যালঘু হিসেবে আখ্যা দেওয়ার সময় বস্তুগত ব্যাপার (যেমন একই জাতিস্বত্তার, ভাষা, বা ধর্মের অস্তিত্ব) এবং বিষয়গত ব্যাপার (যেমন নিজস্ব আত্মপরিচয়) এই উভয়কেই হিসাবে আনতে হবে।

ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সংজ্ঞায়িত করতে গেলে এই চ্যালেঞ্জ আরও বৃদ্ধি পায়। তখন এটি আরও কঠিন হয়ে যায় কারণ ধর্ম কে সংজ্ঞায়িত করতে গেলেই অনেক জটিলতার মুখোমুখি হতে হয়। আন্তর্জাতিক যে দলিলগুলি পাওয়া যায় যেমন ইউনিভার্সাল ডিক্লেয়ারেশন অফ হিউম্যান রাইটস ১৯৪৮, এবং ধর্ম বা বিশ্বাসের পার্থক্যের কারণে উদ্ভূত সকল অসহিষ্ণুতা ও বৈষম্য নিরসনের ঘোষণা দেওয়া ১৯৮১ সালের জেনারেল অ্যাসেমবলি ডিক্লেয়ারেশন, এর কোনটিতেই ধর্ম সম্পর্কে সংজ্ঞা পাওয়া যায় না। এছাড়াও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অনেকসময়ই আরও কিছু পরস্পরচ্ছেদী আত্মপরিচয় থাকে (যেমন জাতিসত্ত্বা, ভাষা, নৃতাত্ত্বিক পরিচয়য়, ভূ-রাজনৈতিক অবস্থান)। তাই শুধু ধর্মের ভিত্তিতে তাদের একটি শ্রেণীভুক্ত করলে সেটা সঠিক চিত্র দেখায় না। আন্তর্জাতিক আইন বিশেষজ্ঞরা এই সমস্যা নিরসনে কিছু সমাধানের সুপারিশ করেন এবং আরও বৃহত্তর পরিসরে বিষয়গুলোকে দেখার পরামর্শ দেনঃ

> অবশ্য, ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ক্ষেত্রে, শুধু ধর্মের সংজ্ঞা বা নিজরাষ্ট্রের আইন কাঠামোতে আইনগত সত্ত্বা হিসেবে তাদের ক্ষমতার সুযোগ কতটুকু এই পর্যন্তই আমাদের প্রশ্ন থেমে থাকে না। তাদের ধর্মাচারণ এবং তদসম্পর্কীয় আলাদা আত্মপরিচয় তাদের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু সমান গুরুত্বের ব্যাপার হল, তাদের এই অবস্থান স্বয়ংক্রিয়ভাবেই তৈরি হয়ে যায় এবং এটা শুধুমাত্র ধর্মীয় অধিকারেই সীমাবদ্ধ না। [4]

ধর্ম বা বিশ্বাসের স্বাধীনতা সমুন্নত রাখা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (SDGs) জন্য গুরুত্বপূর্ণ যা কিনা ২০৩০ সালের মধ্যে সকল ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর জীবনের উন্নতির লক্ষ্যস্থির করেছে। সুতরাং, ধর্ম বা বিশ্বাসের ভিত্তিতে যেসব মানুষ বা গোষ্ঠীর প্রতি বৈষম্য, বঞ্চনা, ও অসমতা দেখানো হচ্ছে তাদেরকে চিহ্নিত করা ও তাদের সম্পর্কে বোঝা বিশ্বব্যাপী SDGs এর লক্ষ্যমাত্রার সাথে সম্পর্কিত। SEA-AIR প্রকল্পটি দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় একটি বৃহত্তর ঐক্যমতে পৌঁছাতে এবং বিভিন্ন ধর্মীয় ঐতিহ্যের ব্যক্তি ও জনগোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান বজায় রাখতে এবং ধর্ম বা বিশ্বাসের স্বাধীনতার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ অর্জনের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখছে। এই কর্মকাণ্ড সরাসরি অবদান রাখে SDG ১৬ তে যেখানে বলা হয়েছেঃ টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ ও সবাইকে নিয়ে গঠিত সমাজের প্রসার করুন, সবার জন্য সুবিচার প্রাপ্তির সুযোগ তৈরি করুন, এবং সকল পর্যায়ে সবার কথা মাথায় রেখে কার্যকর ও জবাবদিহিতামূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলুন। SDG লক্ষ্যমাত্রা ১৬বি[১] SEA-AIR প্রকল্পের জন্য বিশেষ গুরুত্ববহন করেঃ "টেকসই উন্নয়নের জন্য অ-বৈষম্যমূলক আইন ও নীতিমালার প্রণয়ন ও প্রয়োগ করুন।" যেহেতু ধর্মীয় সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর মধ্যে থাকা নারী ও অন্যান্য লিঙ্গীয় সংখ্যালঘুরা আরও অধিকমাত্রায় ঝুঁকির মুখে থাকেন, তাই লিঙ্গীয় সমতা নিশ্চিত করতে (SDG 5) অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে মূল দুশ্চিন্তার জায়গাগুলো চিহ্নিত করে এবং বাস্তব কর্মপদ্ধতি সুপারিশ করতে হবে।

দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জটিল দৃশ্যপট

ধর্মীয় গোষ্ঠীর কথা চিন্তা করলে দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়া পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম বৈচিত্র্যপূর্ণ (জাতিগত সীমান্তের বিস্তৃতির হিসাবে) একটি অঞ্চল। বিভিন্ন গোষ্ঠীর মাঝে যে পারস্পরিক সম্পর্ক রয়েছে (শান্তিপূর্ণ হোক বা না হোক) তা তাৎপর্যপূর্ণ। কয়েক যুগ ধরে ইন্দোনেশিয়া ও অন্যান্য দেশের মুসলিম পুণ্যার্থীরা বাংলাদেশে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম ধর্মসভায় (বিশ্ব ইজতেমা নামে পরিচিত) মিলিত হচ্ছে। বাংলাদেশ, শ্রীলংকা, থাইল্যান্ড, এবং ইন্দোনেশিয়ার হিন্দুরা তীর্থযাত্রায় ভারতে যাচ্ছে। থাইল্যান্ডের নারী বৌদ্ধ ভিক্ষুদের নিযুক্ত করা হচ্ছে শ্রীলংকায়। মিয়ানমারের স্থাপত্যশিল্পীরা বাংলাদেশে বুদ্ধমূর্তি তৈরিতে সাহায্য করছে। তবে অঞ্চলগুলোয় যখন ধর্মীয়-জাতীয়তাবাদ বৃদ্ধি পাচ্ছে , তখন এই ধরণের আন্তঃসংযোগ অপেক্ষাকৃত কম ক্ষমতাধর জনগোষ্ঠী যারা জাতিসত্ত্বা, ধর্ম, ভাষার বিচারে মূল ধারায় পড়ে না, তাদের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। যেমন ভারতে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু ও সংখ্যালঘু

[3] "OHCHR | মাইনরিটিজ আন্ডার ইন্টারন্যাশনাল ল।" মে ১৭, ২০২১ এ দেখা হয়েছে https://www.ohchr.org/EN/Issues/Minorities/Pages/internationallaw.aspx.

[4] গিলবার্ট, জিওফ। "রিলিজিয়াস মাইনরিটিস অ্যান্ড দেয়ার রাইটসঃ আ প্রব্লেম অফ অ্যাপ্রোচ।" ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অন মাইনরিটি অ্যান্ড গ্রপ রাইটস ৫, নাম্বার ২ (১৯৯৭) ৯৭-১৩৪।

মুসলিমদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সহিংসতার ফলে বাংলাদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম ও সংখ্যালঘু হিন্দুদের মধ্যে দাঙ্গা বেঁধে যায়। বৌদ্ধ নিরাপত্তাবাহিনী দ্বারা মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের উপর নিগ্রহ চললে বাংলাদেশের বৌদ্ধরা সহিংসতার আশংকায় থাকে। শ্রীলংকার তামিল জনগোষ্ঠীর ও বাংলাদেশের হিন্দুদের ভারতের প্রতি একটা আলাদা টান আছে বলে ধরে নেওয়া হয় যার ফলে তাদেরকে অপমান, আক্রমণ, এবং উচ্ছেদের লক্ষ্যবস্তু করা হয়। দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠা ও সামাজিক ঐক্য গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আঞ্চলিক পরস্পরনির্ভরশীলতা বুঝে অঞ্চলভিত্তিক কর্মপন্থা গ্রহণ করা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এর পরের অংশে পাঁচটি দেশের অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে এবং অপ্রধান ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর প্রতি ধর্ম ও বিশ্বাসের স্বাধীনতার অধিকার লঙ্ঘনের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। এই অংশের শেষে সুপারিশগুলো তুলে ধরা হয়েছে।

বাংলাদেশঃ

১৯৭১ সালে স্বাধীনতার পর থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বাংলাদেশে নিয়মিতভাবে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সংখ্যা কমেই চলেছে। ইসলাম পরিষ্কারভাবেই সর্ববৃহৎ ধর্ম বিশ্বাস এখানে। বর্তমানে ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী মোট জনসংখ্যার মাত্র ৯.৬% যা পঞ্চাশ বছর আগের ২৩.১% থেকে আশংকাজনকভাবে কম। [5] ২০১১ সালের জাতীয় আদমশুমারি অনুযায়ী হিন্দুরা সবচেয়ে বড় ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী (জনসংখ্যার ৮.৬%), এর পরে আছে বৌদ্ধ (০.৬%), খ্রিষ্টান (০.৩%), এবং অন্যান্য আদিবাসী বিশ্বাস (০.১% এর কম)। এর সাথে কিছু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কিন্তু উল্লেখযোগ্য সম্প্রদায় রয়েছে মূলত সুন্নি মুসলিম অধ্যুষিত বাংলাদেশে যেমন শিয়া মুসলিম (<১%) এবং আহমদিয়া সম্প্রদায় (প্রায় ১০০০০০)[6]. বাংলাদেশের শহুরে সমাজে বাহাই জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় এবং তাদের আনুমানিক সংখ্যা ১০০০০ থেকে ৩০০০০০ এর মধ্যে ওঠানামা করে। [7] সাম্প্রতিক কিছু প্রতিবেদনে দেখা যায় যে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সংখ্যা বিশেষকরে হিন্দুদের সংখ্যা বাংলাদেশে কিছুটা বৃদ্ধি পাচ্ছে। যদিও বাংলাদেশের হিন্দুদের সংখ্যা ১৯৫১-২০১১ সালের মধ্যে ২২% থেকে ৯% এ নেমে এসেছিল [8], এই অনুপাত ২০১৭ সালে কিছুটা বেড়ে ১০.৭% হয়েছে বলে এক হিসাবে দেখা যায়। [9]

বাংলাদেশের সংবিধান সকল ধর্মমত পালনের সমান অধিকার প্রদান করলেও ইসলামকে রাষ্ট্রধর্মের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। সংবিধানের ৩৯ ও ৪১ নং অনুচ্ছেদে সব ধর্ম বিশ্বাস, পালন, ও প্রচারের অধিকার সংরক্ষণ করে চিন্তা, চেতনা, ও ধর্মবিশ্বাসের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে; তবে, "আইন, জনকল্যাণ, এবং নৈতিকতার সাপেক্ষে।" [10] অনুচ্ছেদ ৪১ আরও নিশ্চিত করে সকল ধর্মীয় গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান স্থাপন, রক্ষণাবেক্ষণ, ও পরিচালনার অধিকার। যদিও ব্যক্তির ধর্মবিশ্বাস চিহ্নিতকরণে সরকারিভাবে কোনও হাতিয়ার নেই, ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের পরস্পরছেদী বৈশিষ্ট্য তাদেরদকে কাঠামোগত বৈষম্যের ঝুঁকিতে ফেলে দেয়। উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশে সরকারিভাবে দেওয়া জাতীয় পরিচয়পত্রে ব্যক্তির ধর্ম পরিচয়ের উল্লেখ থাকে না। তবে ব্যক্তির নির্দিষ্ট ধারার নাম কিংবা পোশাক তার ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে জানিয়ে দিতে পারে। সংবিধানের যতই নিশ্চয়তা আর বিধান থাকুক, বাংলাদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী প্রকৃত অর্থেই চলমান বৈষম্য, সহিংসতা, এবং রাষ্ট্র ও ধর্মীয় সংখ্যাগরিষ্ঠের দ্বারা আধিপত্যের সম্মুখীন হন।

---

[5] মাইনরিটি রাইটস গ্রুপ ইন্টারন্যাশনাল, ed. *আন্ডার থ্রেটঃ দ্য চ্যালেঞ্জস ফেইসিং রিলিজিয়াস মাইনরিটিস ইন বাংলাদেশ। রিপোর্ট / মাইনরিটি রাইটস গ্রুপ ইন্টারন্যাশনাল, ২০১৬, [৪] লন্ডন, মাইনরিটি রাইটস গ্রুপ ইন্টারন্যাশনাল, ২০১৬।*

[6] বাংলাদেশে প্রায় ৩০০০০০ উর্দুভাষী জনগোষ্ঠী বাস করে যারা বিহার ও পশ্চিমবঙ্গ থেকে ১৯৪৭ এর দেশভাগের সময় দেশান্তরিত হয়েছিলেন। বিহারিরা সুন্নি মুসলিম এবং জাতি ও ভাষাগত সংখ্যালঘু হিসেবে তাদের ধরা হয়, ধর্মীয় সংখ্যালঘু নয়।

[7] মাইনরিটি রাইটস গ্রুপ ইন্টারন্যাশনাল, ed. *আন্ডার থ্রেটঃ দ্য চ্যালেঞ্জস ফেইসিং রিলিজিয়াস মাইনরিটিস ইন বাংলাদেশ। রিপোর্ট / মাইনরিটি রাইটস গ্রুপ ইন্টারন্যাশনাল, ২০১৬, [৪] লন্ডন, মাইনরিটি রাইটস গ্রুপ ইন্টারন্যাশনাল, ২০১৬।*

[8] হায়দার, এম.মইনুদ্দিন, মিজানুর রহমান, এবং নাহিদ কামাল. "হিন্দু পপুলেশন গ্রোথ ইন বাংলাদেশঃ আ ডেমগ্রাফিক পাজল।" জার্নাল অফ রিলিজিয়ন অ্যান্ড ডেমোগ্রাফি ৬, সংখ্যা ১ (মে ৬, ২০১৯)ঃ ১২৩-৪৮
https://doi.org/10.1163/2589742X-00601003.

[9] "হিন্দু পপুলেশন ইন বাংলাদেশ ইনক্রিজিংঃ দিল্লী" জুন ১৭, ২০২১ এ দেখা হয়েছে.
https://en.prothomalo.com/bangladesh/Hindu-population-in-Bangladesh-increasing-Delhi.

[10] State.gov. "Bangladesh." মে ১২, ২০২১ এ দেখা হয়েছে
https://2009-2017.state.gov/documents/organization/171752.pdf.

শক্তিশালী পক্ষ ও মুনাফালোভী প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিকল্পিত সংঘাত, সহিংসতা, ও দাঙ্গার ফলে এবং জোরপূর্বক উচ্ছেদের কারণে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের দেশান্তরিত (দেশের ভিতরে বা বাইরে) হওয়ার সংখ্যা বেড়ে চলেছে।[11],[12] ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে সহিংসতার একটা বড় অস্ত্র হল তাদের সম্পত্তি রক্ষার অধিকারকে লঙ্ঘন করা। সংখ্যালঘুদের জমি কেড়ে নেওয়া বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেয়েছে কিছু বৈষম্যমূলক আইনের মাধ্যমে যার মধ্যে অর্পিত সম্পত্তি আইন (Vested Property Act (VPA)) প্রধানভাবে উল্লেখযোগ্য। VPA হচ্ছে ১৯৬৫ সালে পাকিস্তান সরকারের প্রণীত শত্রু সম্পত্তি আইনেরই আরেক রূপ যে আইন রাষ্ট্র কর্তৃক মূলত হিন্দুদের জমি ও বাড়িঘর বাজেয়াপ্ত করার অনুমতি দিত যদি তারা তৎকালীন পূর্বপাকিস্তান থেকে ভারতে দেশান্তরিত হত কিংবা যদি ধরে নেওয়া যেত যে তারা ভারতকে সমর্থন করছিল। [13] বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরেও ঐতিহাসিকভাবে VPA এর অস্তিত্ব ‘‘বাংলাদেশে হিন্দুদের এমন নাগরিক হিসেবে চিহ্নিত করে যাদের রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যকে সবসময়ই সন্দেহের চোখে দেখা হয়। [14] এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে VPA এর মাধ্যমে জমি কেড়ে নেওয়ার কারণে প্রায় ১.৫ মিলিয়ন পরিবার প্রায় তিন মিলিয়ন একর জমি হারিয়েছে। এইসমস্ত জমির ৮৭% হচ্ছে হিন্দু ব্যক্তিমালিকানাধীন সম্পত্তি অথবা মন্দিরের জায়গা [15] গত দুই দশকে বাংলাদেশ সরকার অর্পিত সম্পত্তি (প্রত্যার্পণ) আইন ২০০১ এবং অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যার্পণ সংশোধনী ২০১১ এর মাধ্যমে ইতোপূর্বে কেড়ে নেওয়া জমি ফিরিয়ে দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে। তবে এই প্রত্যার্পণ প্রক্রিয়া খুবই ধীরগতির এবং দুর্নীতিতে জরাজীর্ণ। [16]

বাংলাদেশের দণ্ডবিধি অনুযায়ী ধর্মসংক্রান্ত ব্লাসফেমির অপরাধ যেমন ধর্মস্থানের ক্ষতিসাধন, ধর্মাচারে বাধাপ্রদান, কবরস্থানে অনুপ্রবেশ ইত্যাদি শাস্তিযোগ্য অপরাধ। তবে অসংখ্য প্রতিবেদনে দেখা যায় যে সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠী দ্বারা সংখ্যালঘুদের ধর্মস্থানের অবমাননা ও ক্ষতিসাধন করা হয় নিয়মিতভাবে। বাংলাদেশের দণ্ডবিধি এই ব্যাপারে খুবই সীমিত আকারে সুরক্ষা দেয় কিংবা একেবারেই দেয় না। ২০১৮ সালে একটি নতুন আইন প্রণয়ন করা হয় যেখানে ব্লাসফেমির অপরাধ বৃদ্ধি করে অজামিনযোগ্য করা হয় এবং শাস্তি বৃদ্ধি করা হয়। ২০১৮ সালের দ্য ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট (DSA) অনুসারে ‘‘কেউ উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বা জ্ঞাতসারে ধর্মানুভূতিতে আঘাত প্রদানের লক্ষ্যে যেকোন ইলেক্ট্রনিক ফরম্যাটে যেকোন ডিজিটাল স্পেসে যেমন ওয়েবসাইট বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে যদি এমন কিছু প্রকাশ বা প্রচার করে যা ধর্মানুভূতিতে বা ধর্মীয় মূল্যবোধে আঘাত দেয় তাহলে তা এই আইনে শাস্তিযোগ্য হবে।’’[17] অবশ্য এই আইন প্রায় নির্দিষ্টভাবেই ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে ব্যাবহার করা হচ্ছে যেমন হিন্দু বা বাউলদের বিরুদ্ধে ‘‘সংখ্যাগরিষ্ঠের অনুভূতিতে আঘাত’’ দেওয়ার অজুহাতে। [18]

ধর্মীয় মৌলবাদ এবং অসহিষ্ণুতা বাংলাদেশে বেড়েই চলেছে যা ধর্মনিরপেক্ষ ও ভিন্নচিন্তার মানুষদেরকে প্রান্তিক অবস্থানে নিয়ে এসেছে। হেফাজতে ইসলাম নামের একটি মৌলবাদী ইসলামি সংগঠনের জোট নিরবিচ্ছিন্নভাবে আহমদিয়া সম্প্রদায়কে অমুসলিম

---

[11] আহমেদ, হেলাল উদ্দিন। “দ্য পলিটিকাল ইকনমি অফ ল্যান্ড গ্র্যাবিং ইন বাংলাদেশ” দ্য ফিনানশিয়াল এক্সপ্রেস. মে ১২, ২০২১ এ দেখা হয়েছে.
https://thefinancialexpress.com.bd/views/the-political-economy-of-land-grabbing-in-bangladesh-1516809970.

[12] আদনান, স্বপন. “ল্যান্ড গ্র্যাব অ্যান্ড প্রিমিটিভ অ্যাকুমুলেশন ইন ডেলটাটিক বাংলাদেশঃ ইন্টারঅ্যাকশন বিটুইন নিওলিবারেল গ্লোবালাইজেশন, স্টেট ইন্টারভেনশনস, পাওয়ার রিলেশনস অ্যান্ড পীজ্যান্ট রেসিস্টান্স,” দ্য জার্নাল অফ পীজ্যান্ট স্টাডিজ ৪০, সংখ্যা ১ (জানুয়ারি ১, ২০১৩)ঃ ৮৭-১২৮
https://doi.org/10.1080/03066150.2012.753058.

[13] অ্যাকিনস, হ্যারিসন,“চ্যালেঞ্জস টু রিলিজিয়াস ফ্রিডম ইন বাংলাদেশ,” ২০২০, ৫.

[14] ফেল্ডম্যান, শেলী. “দ্য হিন্দু অ্যাজ আদারঃ স্টেট, ল, অ্যান্ড ল্যান্ড রিলেশনস ইন কনটেম্পোরারি বাংলাদেশ।” সাউথ এশিয়া মাল্টিডিসিপ্লিনারি অ্যাকাডেমিক জার্নাল, সংখ্যা ১৩, (এপ্রিল ২২, ২০১৬) https://doi.org/10.4000/samaj.4111.

[15] ইয়াসমিন, তাসলিমা. “দ্য এনিমি প্রপার্টি লজ ইন বাংলাদেশঃ গ্র্যাবিং ল্যান্ডস আন্ডার গুইজ অফ লেজিসলেশন।” অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি কমনওয়েলথ ল জার্নাল ১৫, সংখ্যা ১ (জানুয়ারি ২, ২০১৫)ঃ ১২১-৪৭।
https://doi.org/10.1080/14729342.2015.1101226.

[16] অ্যাকিন্স, হ্যারিসন। “চ্যালেঞ্জস টু রিলিজিয়াস ফ্রিডম ইন বাংলাদেশ, ” ২০২০, ৫।

[17] দ্য ডেইলি স্টার। “ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্টঃ অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট ইস্যুড অ্যাগেইন্সট বাউল রিতা দেওয়ান,” ডিসেম্বর ২, ২০২০।
https://www.thedailystar.net/country/news/digital-security-act-arrest-warrant-issued-against-baul-rita-dewan-2004665.

[18] এন্ড ব্লাস্ফেমি লজ। “’ব্লাস্ফেমি’ লজ ইন বাংলাদেশ।” মে ১২, ২০২১ এ দেখা হয়েছে
https://end-blasphemy-laws.org/countries/asia-central-southern-and-south-eastern/bangladesh/.

ঘোষণা করার দাবী জানিয়ে আসছে সরকারের কাছে। [19] এই দলটি নারীর ক্ষমতায়নের গৃহীত নীতিমালার বিরুদ্ধে সবসময়ই সরব, এবং তারা দেশের শিক্ষা পাঠ্যক্রমকে ইসলামিকরণ করতে সফল হয়েছে। ২০১৩ সাল থেকে প্রাণঘাতী আক্রমণে খুন করা হয়েছে ব্লগার, লেখক, পুরোহিত, পাদ্রি, বিদেশি নাগরিক, ও LGBT অধিকারকর্মীদের। বিগত কয়েক বছরে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের প্রতি ঘৃণা ও গুজব ছড়ানোর পরিমাণ অনেক বেড়েছে। ইসলামি বক্তারা নিয়মিতভাবে অন্যান্য সম্প্রদায় ও অন্যান্য ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সম্পর্কে ঘৃণা ছড়ান দেশব্যাপী ওয়াজ মাহফিলের মাধ্যমে যেখানে, 'সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্পকে উস্কে দেওয়া হয়।" [20] খ্রিস্টান চার্চ, মিশন, ও জনহিতকর প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রায়ই ধর্মান্তরিত করার সন্দেহের চোখে দেখা হয়। খ্রিস্টান কল্যাণ ট্রাস্ট এবং অন্যান্য মানবাধিকার রক্ষা সংক্রান্ত এনজিওর বক্তব্য অনুসারে, খ্রিস্টান ধর্মযাজকগণ হয়রানি, সাম্প্রদায়িক হুমকি, শারীরিক সহিংসতা, এবং সামাজিকভাবে একঘরে করে রাখার মত বিষয়গুলোর সম্মুখীন হন।

সংখ্যালঘু নারীগণ প্রতিনিয়তই বৈষম্যের শিকার হন যা সহিংসতা, নৃশংসতা, ও বৈষম্যের মত শিরোনামগুলোকে ছাড়িয়েও আরও অনেক ব্যাপকভাবে বিস্তৃত। বৈষম্যমূলক ব্যক্তিগত/পারিবারিক আইনের পাশাপাশি সংখ্যালঘু নারীদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, এবং রাজনৈতিক অনেক ক্ষেত্রে বাদ দেওয়া হয়। সাম্প্রদায়িক সহিংসতার প্রসঙ্গে বলা যায়, তাদেরকে প্রায়ই যৌন নিগ্রহের লক্ষ্যবস্তু করা হয়। [21]

জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং স্থানীয় নির্বাচনের সময় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী বিশেষত সংখ্যালঘু নারীদের জন্য বিশেষ ঝুঁকির সময়। উদাহরণস্বরূপ, ২০০১ সালের সংসদ নির্বাচনের পূর্বে ও পরবর্তী সহিংসতায় ৩৫৫ জন প্রান হারান এবং ধর্ষণ, লুটপাট, ও অগ্নিসংযোগের ৩২৭০টি ঘটনা লিপিবদ্ধ করা হয়। [22]

বাংলাদেশে বেশকিছু সরকারি প্রতিষ্ঠানে যেমন পুলিশ, মিলিটারি, এবং বেসামরিক আমলাতন্ত্রে ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা বিভিন্ন রকম বাধার সম্মুখীন হন, তবে এ সংক্রান্ত ক্ষতির পর্যায় কতখানি সে সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না। [23] এক হিসাবে পাওয়া যায় যে সরকারি চাকরির ৫-৭% পদে এবং পুলিশ বাহিনীর ১০% পদে ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা আছেন। [24] গত কয়েক বছরে সংসদে সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্ব আগের চেয়ে বেড়েছে, যেমন ৩০০ টি সংসদীয় আসনের মধ্যে ২০০১ সালে ৩ জন থেকে ২০১৮ সালে ১৭ জনে উন্নীত হয়েছে। বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্ব অসমঅনুপাতে এবং তা ক্রমশ সংকুচিত হচ্ছে। বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ২০১৬ সালে প্রাপ্ত এক তথ্যে দেখা যায় যে মোট ৫০৭১৩ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে মাত্র ৪.৯% ছিল অমুসলিম। [25]

বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে (CHT) দেশের সবচেয়ে বড় আদিবাসী জনগোষ্ঠীর বসবাস যারা মূলত বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, হিন্দু ও প্রকৃতিবাদী ধর্মে বিশ্বাসী। এই অঞ্চল এখনও প্রায় বিশ বছর ব্যাপী চলা শান্তিবাহিনী ও সেনাবাহিনীর সংঘর্ষের ক্ষত সারিয়ে তুলছে। নিয়মিতভাবে জমি দখল, জোর করে ধর্মান্তরিত করা, ধর্ষণ, অপহরণ, খুন, এবং উচ্ছেদ হচ্ছে এই অঞ্চলের প্রধান চলমান সমস্যা যার শিকার আদিবাসী সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী নিয়মিতভাবে হয়ে থাকেন। কক্সবাজার অঞ্চলে প্রায় এক মিলিয়ন রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর অনুপ্রবেশ ওই অঞ্চলের ক্যাম্প এলাকায় ধর্মীয় জনবিন্যাসের চিত্রই পালটে দিয়েছে।

---

[19] ucanews.com. "ক্লারিক ডিমান্ডস বাংলাদেশ আহমাদিস বি ডিক্লেয়ারড 'নন-মুসলিম' – ইউসিএ নিউজ।" মে ১২, ২০২১ এ দেখা হয়েছে https://www.ucanews.com/news/cleric-demands-bangladesh-ahmadis-be-declared-non-muslim/85004.

[20] দ্য ডেইলি অবজারভার। "১৫ নেমড ফর ফ্যানিং কমিউনাল টেনশন, মিলিট্যান্সি থ্রু ওয়াজ- প্রথম পাতা - Observerbd.Com." মে ১২, ২০২১। https://www.observerbd.com/news.php?id=192164.

[21] মাইনরিটি রাইটস গ্রুপ ইন্টারন্যাশনাল, ed. *আন্ডার থ্রেটঃ দ্য চ্যালেঞ্জস ফেইসিং রিলিজিয়াস মাইনরিটিজ ইন বাংলাদেশ।* রিপোর্ট / মাইনরিটি রাইটস গ্রুপ ইন্টারন্যাশনাল, ২০১৬।

[22] পূর্বোক্ত

[23] পূর্বোক্ত

[24] "শেখ হাসিনা গভর্নমেন্ট সেটস প্রিসসিডেন্ট ইন মাইনরিটি রাইটস প্রটেকশন – দ্য ইকনমিক টাইমস।" মে ১২, ২০২১ এ দেখা হয়েছে https://economictimes.indiatimes.com/news/international/world-news/sheikh-hasina-government-sets-precedent-in-minority-rights-protection/articleshow/66825486.cms.

[25] মাইনরিটি রাইটস গ্রুপ ইন্টারন্যাশনাল, ed. *আন্ডার থ্রেটঃ দ্য চ্যালেঞ্জস ফেইসিং রিলিজিয়াস মাইনরিটিস ইন বাংলাদেশ। রিপোর্ট / মাইনরিটি রাইটস গ্রুপ ইন্টারন্যাশনাল, ২০১৬, [৪] লন্ডন, মাইনরিটি রাইটস গ্রুপ ইন্টারন্যাশনাল, ২০১৬।*

COVID-19 মহামারির সময়েও সংখ্যালঘুদের প্রতি অবদমন থেমে থাকেনি। বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ (BHBCUC) ২০২০ সালের মার্চ ও সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ে ধর্মীয় ও জাতিসত্ত্বাগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর মধ্যে ১৭টি হত্যার কথা জানিয়েছে। [26]

এইসব সংঘাত ও সহিংসতার বিরুদ্ধে একসাথে কাজ করার ব্যাপারে আন্তঃধর্মীয় সহযোগিতা এবং ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে সৌহার্দ্যের উদাহরণ রয়েছে। রমজান মাসে গরীব মুসলিমদের জন্য বৌদ্ধ উপাসনালয়গুলোতে প্রায়ই ইফতার বিতরণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। [27] সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী ২০১৯ এর এপ্রিলে সারাদেশজুড়ে ইমামগণ তাদের শুক্রবারের জুম্মার খুতবায় সন্ত্রাসবাদ ও উগ্রবাদবিরোধী যৌথ বিবৃতি প্রদান করেন।

মিয়ানমারঃ

মিয়ানমার ৫৬.৬ মিলিয়ন জনসংখ্যা নিয়ে প্রধানত একটি বৌদ্ধ দেশ যার ৮৮% থেরাভাদা বৌদ্ধ, ৬% খ্রিস্টান, এবং ৪% মুসলিম। অন্যান্য ধর্মের মধ্যে আছে হিন্দু, জৈন, এবং লোকায়ত বিশ্বাস। [28] যদি সংক্ষেপে বিচার করা যায় তাহলে বলা যায় যে, মিয়ানমারে উপাসনার স্বাধীনতা আছে কিন্তু ধর্মীয় স্বাধীনতা নেই। ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী রাষ্ট্র কর্তৃক আরোপিত নিষেধাজ্ঞার মুখোমুখি হন বেশ কিছু ব্যাপারে। যেমন, প্রকাশনা, জনসম্মুখে বক্তৃতা, আন্তর্জাতিক অতিথিদের আমন্ত্রণ জানানো, এবং জনসংযোগের মত অধিকারের ক্ষেত্রে। যেসব ভুল ধারণা সামাজিক আচরণের অনেক গভীরে প্রোথিত, সেগুলোর দ্বারা মূলত মুসলিমরা ক্ষতিগ্রস্থ হলেও, খ্রিস্টান, হিন্দু, এবং অন্যান্য জনগোষ্ঠীও বাদ যায় না। এর ফলে ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর সদস্যদের প্রতি বৈষম্যের সুযোগ তৈরি হয়। এমন একটি বহুল প্রচলিত আচরণ হচ্ছে "পশ্চিমা দরজা" ধারণা। এই ধারণা অনুসারে বার্মিজ সমাজ এবং বৌদ্ধরা পশ্চিম দিকের পাহাড়গুলো থেকে নেমে আসা মুসলিম স্রোতের বিরুদ্ধে ঢাল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে যে মুসলিম স্রোত নেমে আসলে বার্মার বৌদ্ধরা মুছে যাবে। [29] রাষ্ট্র এবং সমাজের প্রভাবশালী পক্ষ এমন ধরণের ধারণাকে চিরস্থায়ী রূপ দেওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করে। দমনমূলক কার্যক্রম মূলত দেশটির কিনারার দিকে বসবাসরত জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বেশি ক্ষতিগ্রস্থ করে। বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর বেশীরভাগ অংশের মধ্যে একটি (ভুল) ধারণা আছে যে মুসলিম জনসংখ্যা বেশি দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে, যদিও যেসব তথ্য পাওয়া যায় এই বিষয়ে সেগুলো এই দাবীকে সমর্থন করে না। ১৯৭৩ ও ২০১৪ সালের আদমশুমারির তথ্য থেকে দেখা যায় যে মুসলিম জনসংখ্যা মাত্র ০.৪% বৃদ্ধি পেয়ে ৩.৯% থেকে ৪.৩% হয়েছে। [30] এখানে মনে রাখা দরকার যে ২০১৪ সালের আদমশুমারিতে রোহিঙ্গাদের পুরোপুরি বাদ দেওয়া হয়েছে গণনা থেকে। সরকারি ও বেসরকারি সূত্রমতে ২০১৬ সালের অক্টোবরের আগে প্রায় ১.১ মিলিয়ন রোহিঙ্গা মুসলিম মিয়ানমারে বসবাস করত। ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সংঘটিত সামরিক অভ্যুত্থান ইতোমধ্যে থাকা দ্বন্দ্বকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে গেছে মিয়ানমারের "ধর্মবিশ্বাসের স্বাধীনতা লঙ্ঘনের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে।" [31]

ধর্মীয় এবং জাতিগত পরিচয় মিয়ানমারে এমন গুরুত্বপূর্ণভাবে পরস্পরকে অতিক্রম যে এর মাধ্যমে নির্দিষ্ট কিছু জনগোষ্ঠী প্রান্তিক পর্যায়ে পৌঁছে যায়। নাগরিক সুবিধা এবং অন্যান্য সরকারি সুবিধা যেমন জনশিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তি নির্ভর করে এধরণের

---

[26] ইউনাইটেড স্টেটস ডিপার্টমেন্ট অফ স্টেট। "বাংলাদেশ।" মে ১২, ২০২১ এ দেখা হয়েছে https://www.state.gov/reports/2020-report-on-international-religious-freedom/bangladesh/.

[27] "বুদ্ধিস্ট মনকস ইন বাংলাদেশ অফার ইফতার টু নিডি মুসলিমস ডিউরিং রামাদান। বুদ্ধিস্টডোর।" মে ১৩, ২০২১ এ দেখা হয়েছে https://www.buddhistdoor.net/news/buddhist-monks-in-bangladesh-offer-iftar-to-needy-muslims-during-ramadan.

[28] ইউনাইটেড স্টেটস ডিপার্টমেন্ট অফ স্টেট। "বার্মা।" মে ১৩, ২০২১ এ দেখা হয়েছে. https://www.state.gov/reports/2020-report-on-international-religious-freedom/burma/.

[29] মিয়ানমার কান্ট্রি প্রোফাইল অন ফ্রিডম অফ রিলিজিয়ন অর বিলিফ (FoRB) ওয়ার্ল্ড ফেইথস ডেভেলপমেন্ট ডায়ালগ ফেব্রুয়ারি ২০২০

[30] ফিংক, ক্রীস্টিয়ানা। "মিয়ানমারঃ রিলিজিয়াস মাইনরিটিস অ্যান্ড কন্সটিটিউশনাল কোশ্চেনস।" এশিয়ান অ্যাফেয়ার্স ৪৯। সংখ্যা ২, (এপ্রিল ৩, ২০১৮)ঃ ২৫৯-৭৭। https://doi.org/10.1080/03068374.2018.1469860.

[31] পারসিকিউশন। "ক্যু ইন মিয়ানমার ফলোস হিস্টরি অফ সিভিয়ার রিলিজিয়াস ফ্রিডম ভায়োলেশনস," ফেব্রুয়ারি ২২, ২০২১। https://www.persecution.org/2021/02/22/coup-myanmar-follows-severe-history-religious-freedom-violations/.

পরিচয়ের উপর। বামার বা বার্মিজ জাতিগোষ্ঠী, যারা মূলত বৌদ্ধ, তারা হচ্ছে জাতিগত সংখ্যাগরিষ্ঠ, এবং তারাই মূলত পূর্ণ নাগরিক সুবিধা এবং পেশাগত ও সামাজিক ক্ষেত্রে বেশী সুযোগ পেয়ে থাকেন। শান, মন, এবং রাখাইন বৌদ্ধরাও নাগরিক সুবিধা পেয়ে থাকেন, তবে তারাও সংখ্যাগুরু বামারদের কাছে বৈষম্যের শিকার হতে পারেন। সরকারপ্রদত্ত পরিচয় পত্রে ব্যক্তির ধর্ম পরিচয় উল্লেখ করা থাকে এবং এই পরিচয় পত্র নিরাপত্তাবাহিনীর সদস্যদের দেখাতে হয়, এবং সরকারি সেবা পেতে বা চাকরির সময় প্রয়োজন হয়। কাচিন, চিন, নাগা, এবং কারেন জাতিসত্ত্বাসমূহ মূলত খ্রিস্টধর্ম মেনে চলে এবং তাদেরকেও "জাতীয় জাতিসত্ত্বার" তালিকায় স্থান দেওয়া হয়েছে। [32] অবশ্য ১৯৮০ সাল থেকে ব্যাবহার হওয়া ১৩৫টি জাতিসত্ত্বার এই তালিকায় রোহিঙ্গাদের জায়গা হয়নি যা কিনা বর্তমানে রোহিঙ্গাদের নাগরিক সুবিধাদানে অস্বীকৃতির ভিত্তি তৈরি করেছিল বলে মনে করা হয়। [33]

মিয়ানমারের সংবিধান চিন্তার স্বাধীনতা এবং নিজের ধর্মবিশ্বাস প্রকাশ ও পালনের অধিকার নিশ্চিত করে। তবে, এই বিধানের কিছু শর্ত আছে যেমন, জনশৃঙ্খলা, স্বাস্থ্য, নৈতিকতা, অথবা সংবিধানের অন্যান্য বিধান যেমন নিরাপত্তা, আইন-শৃঙ্খলা, ও সামাজিক শান্তির প্রতি তা হুমকিস্বরূপ হতে পারবে না। [34] এই আইনের মাধ্যমে ধর্ম অবমাননা, ধর্মস্থান ও কবরস্থানে অনুপ্রবেশ, ধর্মের নামে কাউকে আঘাত বা অপমান করা, এবং ধর্মীয় উত্তেজনা তৈরির বিরুদ্ধে সুরক্ষা দেওয়া হয়েছে। ধর্মীয় ব্যক্তিসমূহ (যেমন পুরোহিত, সাধু, নান ইত্যাদি) ভোট দিতে পারেন না এবং সরকারি অফিসের দায়িত্বে থাকতে পারেন না। সংবিধানে "রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মের অপব্যাবহারকেও নিষিদ্ধ করা হয়েছে।" [35] মিয়ানমারের কোনও রাষ্ট্রধর্ম নেই, তবে সংবিধানে বৌদ্ধ ধর্মকে বিশেষ অবস্থান দেওয়া হয়েছে সংখ্যাগরিষ্ঠের ধর্ম হিসেবে। সকল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন করা বাধ্যতামূলক।

USDP সরকারের আমলে জাতি অ ধর্ম সম্পর্কিত চারটি আইন পাশ করা হয় ২০১৫ সালে। এই আইনগুলো তৈরি ও পুনঃনিরীক্ষণ করেছে যথাক্রমে অর্গানাইজেশন ফর দ্য প্রটেকশন অফ রেস অ্যান্ড রিলিজিয়ন এবং ধর্ম মন্ত্রণালয়। এই আইনের উদ্দেশ্য ছিল কিছু কিছু ব্যাপারে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা যেমন, ধর্মান্তরিতকরণ, ভিন্ন ভিন্ন ধর্মীর বিবাহ, বহুবিবাহের শাস্তিবিধান, এবং "সরকারের যেখানে মনে হয় সেখানে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের পদক্ষেপ নেওয়ার অনুমতি দেওয়া।"[36] যদিও এই আইন সব ধর্মের মানুষের জন্যই প্রযোজ্য, সমালোচকগণ বলে থাকেন যে এই আইনের মূল লক্ষ্য হল "ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়া সীমিত করা, মুসলিম পুরুষ ও বৌদ্ধ নারীর মধ্যে বিয়ে ঠেকানো, মুসলিম পুরুষের একাধিক স্ত্রী গ্রহণ বন্ধ করা, এবং মুসলিমদের বড় পরিবার গঠনকে থামানো।"[37]

যদিও ধর্মীয় বৈচিত্র্য মিয়ানমারের দৈনন্দিন জীবনের অংশ, উগ্র বৌদ্ধ জাতীয়তাবাদ দিন দিন বাড়ছে, বিশেষকরে গত এক দশক ধরে। যার ফলে বৌদ্ধ ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের মাঝে উত্তেজনা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ক্রমশ বাড়তে থাকা বৌদ্ধদের একটি অংশ আশা করে যে রাষ্ট্র যেন "তার প্রতি অর্পিত দায়িত্ব অনুযায়ী সঠিকভাবে বৌদ্ধ শাসনের সুরক্ষা ও বিস্তার ঘটায় এবং যেসব উপাদান সেই পথে হুমকিস্বরূপ সেগুলোকে নিষ্ক্রিয় করতে সচেষ্ট হয়।"[38] অর্গানাইজেশন ফর দ্য প্রটেকশন অফ রেস অ্যান্ড রিলিজিয়ন (যা মূলত বার্মিজে মা বা থা নামে পরিচিত) সারাদেশে উগ্র বৌদ্ধ জাতীয়তাবাদ ছড়িয়ে দিচ্ছে এর "স্বায়ত্তশাসিত শাখাগুলো এবং এবং এর সাথে জড়িত সন্ন্যাসী ও স্বেচ্ছাসেবক নেতাদের মাধ্যমে।" [39] মা বা থা অনলাইন ও অফলাইন উভয় মাধ্যমকেই ব্যবহার করছে

---

[32] জাতীয় জাতিস্বত্ত্বা হল তারা যারা ঔপনিবেশিক সময়েরর আগে থেকে সেদেশে বসবাস করে আসছে বলে রাষ্ট্র বিশ্বাস করে।

[33] রোহিঙ্গাদের বাঙালি বলে গণ্য করা হয় যারা কিনা ঔপনিবেশিক প্রশাসনের অংশ হিসেবে মিয়ানমারে গিয়েছিল বলে রাষ্ট্র মনে করে। এই প্রসঙ্গে আরও জানতে দেখুন, ফিংক, ক্রিস্টিয়ানা। "মিয়ানমারঃ রিলিজিয়াস মাইনরিটিস অ্যান্ড কন্সটিটিউশনাল কোশ্চেনস।" এশিয়ান অ্যাফেয়ার্স ৪৯। সংখ্যা ২, (এপ্রিল ৩, ২০১৮)ঃ ২৫৯-৭৭। https://doi.org/10.1080/03068374.2018.1469860.

[34] ইউনাইটেড স্টেটস ডিপার্টমেন্ট অফ স্টেট। "বার্মা।" মে ১৩, ২০২১ এ দেখা হয়েছে। https://www.state.gov/reports/2020-report-on-international-religious-freedom/burma/.

[35] পূর্বোক্ত

[36] ফিংক, ক্রীস্টিয়ানা। "মিয়ানমারঃ রিলিজিয়াস মাইনরিটিস অ্যান্ড কন্সটিটিউশনাল কোশ্চেনস।" এশিয়ান অ্যাফেয়ার্স ৪৯। সংখ্যা ২, (এপ্রিল ৩, ২০১৮)ঃ ২৫৯-৭৭। https://doi.org/10.1080/03068374.2018.1469860.

[37] পূর্বোক্ত

[38] হেইওয়ার্ড, সুসান। "দ্য ডাবল- এডজেড সোর্ড অফ "বুদ্ধিষ্ট ডেমোক্রেসি" ইন মিয়ানমার।" দ্য রিভিউ অফ ফেইথ & ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেইয়ারস ১৩। সংখ্যা ৪ (অক্টোবর ২, ২০১৫)ঃ ২৫-৩৫ https://doi.org/10.1080/15570274.2015.1104967.

[39] ফিংক, ক্রীস্টিয়ানা। "মিয়ানমারঃ রিলিজিয়াস মাইনরিটিস অ্যান্ড কন্সটিটিউশনাল কোশ্চেনস।" এশিয়ান অ্যাফেয়ার্স ৪৯। সংখ্যা ২, (এপ্রিল ৩, ২০১৮)ঃ ২৫৯-৭৭। https://doi.org/10.1080/03068374.2018.1469860.

সংখ্যাগরিষ্ঠের কাছে বার্তা পৌঁছে দিতে, ইসলামফোবিয়ায় ইন্ধন যোগাতে, এবং ভয় দেখিয়ে উত্তেজনা বাঁচিয়ে রাখতে যে মুসলিমরা মিয়ানমার দখল করে নেবে। [40]

ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের প্রতি অসহিষ্ণুতা এবং মুসলিম বিরোধী নীতি মিয়ানমারের অনেক প্রদেশজুড়েই বিস্তৃত। মুসলিম মালিকানাধীন ব্যবসা বর্জন করতে ৯৬৯ প্রচারণা ২০১২ সালে মন প্রদেশে শুরু হয় এবং অতঃপর সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। [41] কাচিন এবং চিন প্রদেশে খ্রিষ্টান অধ্যুষিত এলাকায় বৌদ্ধ অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে। সেনাশাসন সমর্থক বৌদ্ধ জাতীয়তাবাদীরা চিন ও কারেন প্রদেশে খ্রিস্টানদেরও ঘরবাড়ি ও উপাসনাস্থল ভেঙ্গে দিয়েছে, শারীরিকভাবে হামলা করেছে, এবং উচ্ছেদ করেছে। [42] মিয়ানমারের খ্রিস্টানদের জন্য নতুন চার্চ বানানোর জন্য জমি খুঁজে পাওয়া ক্রমশই কঠিন হয়ে উঠছে। রাখাইন প্রদেশের মুসলিম ও হিন্দু রোহিঙ্গাদের চলাচলে কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করা। একই ধরণের নিষেধাজ্ঞা মুসলিমদের জন্য রাখাইনের বাইরেও প্রযোজ্য যেখানে সাধারণত অভিবাসন ফর্ম পূরণ করতে হয়। [43] এমনও ঘটনা আছে যেখানে গ্রামে বা হাসপাতালে ব্যানার টানানো হয়েছে যে "মুসলিমদের প্রবেশ নিষেধ।" [44]

সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে উত্তেজনা বৃদ্ধিতে মিয়ানমারে ডিজিটাল এবং অন্যান্য মাধ্যম উভয়ই ব্যবহার করা হয়। গুজব, ভুল বা বদলে দেওয়া তথ্য, সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে প্রাণঘাতী অস্ত্র। ২০১২ সালের এক সাম্প্রদায়িক সহিংসতার সূত্রপাত হয়েছিল একটি গুজবের দ্বারা যে একজন মুসলিম পুরুষ একজন বৌদ্ধ নারীকে ধর্ষণ করেছে। এই সহিংসতার ফলে ১৬০ জনের প্রাণহানি হয় এবং ১০০০০০ রোহিঙ্গা তাদের বসতি থেকে উচ্ছেদ হয়। প্রতিবেদনে বলা হয় যে ২০১২ সালের প্রাণঘাতী দাঙ্গার ফলস্বরূপ আরাকান রোহিঙ্গা স্যালভেশন আর্মির (ARSA) জন্ম হয় ২০১৩ সালে যারা ২০১৬ এর অক্টোবরে এবং ২০১৭ এর আগস্টে মিয়ানমারের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর উপর প্রাণঘাতী আক্রমণ চালায়। [45] এর ঢেউ ছড়িয়ে পরে এবং মিয়ানমারের নিরাপত্তা বাহিনী এবং বৌদ্ধ আধা-সামরিক বাহিনী রোহিঙ্গাদের উপর আক্রমণ শুরু করে। এতে ৬৭০০ নারী, পুরুষ, ও শিশু নিহত হয়। শত শত গ্রামে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় এবং প্রায় এক মিলিয়ন রোহিঙ্গা বাংলাদেশে পালিয়ে বাঁচে।

শিক্ষা এমন একটি খাত যেখানে উল্লেখযোগ্য ধর্মীয় বৈষম্য আছে। মিয়ানমারে সরকারি স্কুলগুলোতে নির্দিষ্ট বিষয় হিসেবে আলাদা করে ধর্ম পড়ানো হয় না। তবে স্কুলের অনেক আচার প্রথাগত বৌদ্ধ ধর্মাচার থেকে এসেছে। অনেক সরকারি স্কুলে শিক্ষার্থীদেরকে বৌদ্ধ প্রার্থনামন্ত্র আবৃত্তি করতে হয়। বৌদ্ধ ধর্মীয় পূজার বেদী ও প্রতীক অনেক স্কুল প্রাঙ্গণেই উপস্থিত।

কিছু প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে যে "সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক আত্তীকরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।" উদাহরণ হিসেবে চিন প্রদেশের না তা লা স্কুলগুলোর কথা বলা যায়। এই স্কুলগুলিতে পড়তে হলে খ্রিস্টান বাচ্চাদের বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হতে হয়। [46] জাতীয় পাঠ্যসূচির বইগুলোতে প্রায়শই ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের সম্পর্কে অবমাননাকর বর্ণনা দেওয়া থাকে। প্রায়শই স্কুলগুলোতে বাচ্চাদের ভর্তি করাতে গেলে নাগরিকত্বের প্রমাণ দিতে হয় যার ফলে অস্বীকৃত সংখ্যালঘুদের জন্য কোনও সুযোগই থাকে না। রোহিঙ্গাদের চলাচলের উপর বিধিনিষেধ তাদেরকে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে বাধা প্রদান করে। ২০১৮-২০১৯ শিক্ষাবর্ষ থেকে রাখাইন প্রাদেশিক সরকার এবং কিছু মানবতাবাদী সংস্থা দূরশিক্ষণ পদ্ধতির মাধ্যমে রোহিঙ্গাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ তৈরি করেছে।

---

[40] পূর্বোক্ত

[41] দ্য অবজারভার- ফ্রান্স ২৪। "৯৬৯"ঃ দ্য থ্রি ডিজিটস দ্যাট আর টেরিফায়িং মুসলিমস ইন বার্মা," মে ৩, ২০২১। https://observers.france24.com/en/20130503-%E2%80%98969%E2%80%99-digits-terrifying-muslims-burma.

[42] ইউনাইটেড স্টেটস ডিপার্টমেন্ট অফ স্টেট। "বার্মা।" মে ১৩, ২০২১ এ দেখা হয়েছে। https://www.state.gov/reports/2020-report-on-international-religious-freedom/burma/.

[43] পূর্বোক্ত

[44] ফিংক, ক্রীস্টিয়ানা। "মিয়ানমারঃ রিলিজিয়াস মাইনরিটিস অ্যান্ড কন্সটিটিউশনাল কোশ্চেনস।" এশিয়ান অ্যাফেয়ার্স ৪৯। সংখ্যা ২, (এপ্রিল ৩, ২০১৮)ঃ ২৫৯-৭৭। https://doi.org/10.1080/03068374.2018.1469860.

[45] "মিয়ানমারঃ হু আর দ্য আরাকান রোহিঙ্গা স্যালভেশন আর্মি?" *বিবিসি নিউজ,* সেপ্টেম্বর ৫, ২০১৭, সেকশন। এশিয়া। https://www.bbc.com/news/world-asia-41160679.

[46] পূর্বোক্ত

বৈষম্যমূলক আচরণ সরকারি চাকরি প্রাপ্তি বা রাজনীতিতে যুক্ত হবার ক্ষেত্রেও নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। ১৯৬০ এর দশক থেকে মুসলিমদের জন্য মিয়ানমারের সামরিক বাহিনীতে ঢোকা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে। খ্রিস্টানদের ক্ষেত্রেও এই সংখ্যা ক্রমশ কমে আসছে। যদিও এই বৈষম্যের ব্যাপারে কোনও লিখিত প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা, বিশেষ করে মুসলিম ও খ্রিস্টানরা মনে করেন এটাই প্রকৃত অবস্থা। বর্তমানে প্রায় সব সরকারি ও সামরিক পদ বৌদ্ধদের অধীনে। চাকরির আবেদনে প্রার্থীর ধর্মীয় তথ্য উল্লেখ করতে হয় যেটা কিনা তারপর আবার পুনঃনিরীক্ষণের মধ্যে দিয়ে যায়। যার ফলে সংখ্যালঘু প্রার্থীরা বাদ পড়ে যায়। পার্লামেন্টে বৌদ্ধরা বাকি সবাইকেই অবিচ্ছিন্নভাবে ছাড়িয়ে গেছে সংখ্যার দিক থেকে। রোহিঙ্গারা ভোট দিতেও পারে না, ভোটে দাঁড়াতেও পারে না।

ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের প্রতি অসমতা ও বৈষম্য COVID-19 মহামারির সময় আরও বেড়েছে। এর কারণ হল সরকারের অসঙ্গতিপূর্ণ বিধিনিষেধ প্রণয়ন এবং সেগুলোর পক্ষপাতদুষ্ট বাস্তবায়ন। COVID-19 এর বিধিনিষেধ ভঙ্গের ক্ষেত্রে সংখ্যালঘুদের প্রতি বেশি কঠোর প্রতিক্রিয়া দেখানো হয়েছে অন্যদের তুলনায়। বাংলাদেশ থেকে ফিরে যাওয়া রোহিঙ্গাদের একঘরে করা হয়েছে এবং তাদেরকে রোগ ছড়ানোর কারণ হিসেবে দেখানো হয়েছে। [47]

শ্রীলংকাঃ

শ্রীলংকা মূলত বৌদ্ধ সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ হলেও এখানে বিভিন্ন ধর্ম পালন করা উল্লেখযোগ্য সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী রয়েছে। শ্রীলংকার এমন ধর্মীয় প্রেক্ষাপট সেদেশের ঐতিহাসিক ও সমসাময়িক কিছু দ্বন্দ ও সহিংসতার জন্ম দিয়েছে। পুরো জনসংখ্যার প্রায় ৭০.২% বৌদ্ধও, ১২.৬% হিন্দু, ৯.৭% মুসলিম, এবং ৭.৪% খ্রিস্টান। জাতিস্বত্তা এবং ধর্ম জটিলভাবে সম্পর্কিত এখানে, বেশীরভাগ সিংহলী বৌদ্ধ, বেশীরভাগ তামিল হিন্দু, এবং বেশীরভাগ মুসলিম নিজেদেরকে আলাদা জাতিস্বত্তার অংশ বলে মনে করেন। [48]

ধর্মীয় গোষ্ঠীসমূহের অবস্থান এবং বৌদ্ধধর্মের প্রাধান্য আইন ও আচরণের দ্বারা সুনির্ধারিত। বৌদ্ধধর্ম রাষ্ট্রধর্ম নয়, তবে সরকার প্রকাশ্যেই একে সুরক্ষা দেয় ও সমুন্নত করার চেষ্টা করে। শ্রীলংকার সংবিধান সকল নাগরিকের ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকারকে নিশ্চিত করে, তবে বৌদ্ধধর্মের স্থান অবশ্যই সবার আগে। ২০০৩ সালে সুপ্রিম কোর্টের দেওয়া এক আদেশের দুটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান আছে। একটি হল, বৌদ্ধধর্ম ছাড়া অন্য কোনও ধর্ম রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা পাবে না, অন্যটি হল ধর্মান্তরিতকরণ সাংবিধানিকভাবে সুরক্ষাপ্রাপ্ত নয়। [49] ২০১৭ সালে সুপ্রিম কোর্ট আদেশ জারি করে যে ব্যক্তির ধর্ম প্রচারের অধিকার সাংবিধানিকভাবে সুরক্ষিত নয়। শ্রীলংকায় চারটি রাষ্ট্র-স্বীকৃত ধর্ম যথাঃ বৌদ্ধধর্ম, হিন্দুধর্ম, ইসলাম ধর্ম, ও খ্রিস্টধর্মের জন্য কোনও কেন্দ্রীয় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন প্রয়োজনীয় নয়। তবে নতুন কোনও ধর্মীয় গোষ্ঠীকে তাদের উপাসনাস্থল তৈরি, ধর্ম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালানো, ধর্মীয় কর্মী নিয়োগ, এবং এসব কার্যক্রম চালানোর জন্য সরকারের কাছে ভর্তুকির জন্য আবেদন করার আগে অবশ্যই সরকারের কাছে নিবন্ধন করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী বুদ্ধ শাসন মন্ত্রণালয়ের প্রধান যার অধীনে প্রতিটি প্রধান ধর্মের জন্য একটি করে মন্ত্রীসভাবিহীন বিভাগ রয়েছে। সরকারি ও বেসরকারি স্কুলগুলিতে জাতীয় পাঠ্যসূচি অনুযায়ী প্রধান ধর্মগুলি আবশ্যিক বিষয় হিসেবে পড়ানো বাধ্যতামূলক প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে। শিক্ষার্থীরা সাধারণত তাদের পারিবারিক ধর্ম বেছে নেয় পড়ার জন্য।

কয়েক দশক ধরে চলা গৃহযুদ্ধের ক্ষত শ্রীলংকার ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের প্রতিদিনের জীবনে এখনও দৃশ্যমান। দেশটির উত্তর ও পূর্বাঞ্চলে তামিল ও মুসলিম জনগোষ্ঠীর অনেক সদস্য এখনও বসতবাড়িহীন হয়ে ইন্টারনালি ডিসপ্লেসড পপুলেশন (**IDP**) ক্যাম্পে মানবেতর জীবন কাটাচ্ছে।

---

[47] ইউনাইটেড স্টেটস ডিপার্টমেন্ট অফ স্টেট। "বার্মা।" মে ১৩, ২০২১ এ দেখা হয়েছে।
https://www.state.gov/reports/2020-report-on-international-religious-freedom/burma/.

[48] ধর্মীয় জনবিন্যাস এবং তাদের ভূপ্রকৃতিগত বিন্যাস নিয়ে বিস্তৃত আলোচনার জন্য এখানে দেখুনঃ
ইউনাইটেড স্টেটস ডিপার্টমেন্ট অফ স্টেট। "শ্রীলংকা।" মে ১৪, ২০২১ এ দেখা হয়েছে।
https://www.state.gov/reports/2020-report-on-international-religious-freedom/sri-lanka/.

[49] পূর্বোক্ত

বিভিন্ন প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে সামরিকীকরণের মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে তামিল ও মুসলিম জনগোষ্ঠীকে প্রান্তিক অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তাদেরকে পর্যাপ্ত থাকার জায়গা দেওয়া হয়নি, এবং আন্তর্জাতিক মান লঙ্ঘন করে তাদের জন্য খুবই সীমিত আকারে জীবিকার সুযোগ রাখা হয়েছে। [50] এমনকি ২০০৯ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধের সমাপ্তি ঘোষণার পরেও এখনও শ্রীলংকার মিলিটারি তামিলদের জায়গাজমি দখল করে রেখেছে "উচ্চমাত্রার নিরাপত্তা অঞ্চল" এর নামে। [51] ১৯৭৯ সালের দ্য প্রিভেনশন অফ টেররিজম অ্যাক্ট পুলিশকে বিস্তৃত ক্ষমতা দিয়েছে কাউকে তল্লাশি করতে, গ্রেফতার করতে, এবং শাস্তি দিতে। এই আইন অসমভাবে তামিল ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে ব্যাবহার করা হয়। [52] গবেষণায় দেখা গেছে যে সরকারিভাবে পৃষ্ঠপোষকতা প্রাপ্ত "সিংহলিকরণ"প্রক্রিয়া তামিল সংস্কৃতিকে মুছে দেওয়ার জন্য ইচ্ছাকৃত প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। যেমন সিংহলি ভাষায় রাস্তার পথনির্দেশক, রাস্তা, গ্রাম, ও স্থাপনার নাম লেখা, বৌদ্ধ স্থাপনা তৈরি ইত্যাদি। [53] জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার রক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো নিয়মিতভাবে তামিল নারীদের উপর ধর্ষণ ও যৌন নিগ্রহের ঘটনা তুলে ধরছে। [54]

আজকের দিনে অন্যান্য আরও সব দুশ্চিন্তার সাথে বিভিন্নরকম বিষাক্ত জাতীয়তাবাদ একটি বড় দুশ্চিন্তার কারণ। এগুলো অনেকসময়ই বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের দ্বারা প্রচারিত এবং বৈষম্য, ঘৃণা, ও সহিংসতা ছড়ায়। বৌদ্ধ জাতীয়তাবাদ শ্রীলংকান রাজনীতিতে অনেকদিন ধরেই একটি চালিকাশক্তি। এটি এমন ধারনার উপর প্রতিষ্ঠিত যে যদিও শ্রীলংকায় বহুসাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ক্রমশ সঙ্কুচিত হয়ে আসছে, তারপরও শ্রীলংকা হচ্ছে শুধু সিংহলি বৌদ্ধদের। তামিল, মুসলিম, এবং খ্রিস্টানরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে বঞ্চনার শিকার হয়েছেন। মুসলিম জনগোষ্ঠীর প্রতি শ্রীলংকার বৈষম্যের ব্যপারটা প্রথম সামনে আসে ২০১৯ সালে মুসলিম গ্রুপের দ্বারা সংঘটিত ইস্টার বোমা হামলার মাধ্যমে যার ফলে ২৬৮ জন প্রাণ হারান। বৌদ্ধ উগ্রবাদী সংগঠন যেমন বদু বালা সেনা (BBS) নিরবিচ্ছিন্নভাবে মুসলিম জনগোষ্ঠীকে লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে আসছে এবং তাদের সাংস্কৃতিক আচরণগুলো নিয়ে সমালোচনা করে আসছে যেমন তাদের পোশাকরীতি, নামাজের রীতি, এবং হালালভাবে পশু জবাইয়ের রীতি।[55] ২০১৮ সালের কান্ডিতে ঘটা সাম্প্রদায়িক সহিংসতার সময় দেখা গেছে শত শত সিংহলি বৌদ্ধ মুসলিম গ্রামগুলোতে আক্রমণ চালাচ্ছে। বিষাক্ত গুজব ও ঘৃণা ছড়ানোর উদাহরণ হিসেবে কঠোরবাদী বৌদ্ধদের মন্তব্য তুলে ধরা যায় যেমন তারা বলেছে, "মুসলিম ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে যেও না কারণ মুসলিম মালিকানাধীন কাপড়ের দোকানে মেয়েদের অন্তর্বাসে নির্বীজকরণ করা হয় যাতে করে সিংহলি জনসংখ্যা কমে যায়।" [56] শ্রীলংকান খ্রিস্টানদের সংগঠন যেমন ন্যাশনাল ক্রিশ্চিয়ান ইভাঞ্জালিকাল অ্যালিয়েন্স অফ শ্রীলংকা (NCEASL) জানিয়েছে যে স্থানীয় সরকারি সংস্থাগুলোর মদদে উগ্র জাতীয়তাবাদী বৌদ্ধ গ্রুপ প্রায়ই খ্রিস্টানদের উপাসনায় বিঘ্ন ঘটায়। [57]

এমন জাতীয়তাবাদে রাষ্ট্রীয় সমর্থন বৈষম্যমূলক প্রভাব আরও বাড়ায়। প্রতিবেদনে দেখা যায় যে ২০১৯ সালের বোমা হামলার পর সরকার BBS এর মত ইসলামফোবিক সুরে কথা বলা শুরু করেছে। [58] ইসলামিক নেতাদের গণগ্রেফতারের পাশাপাশি সরকারি

[50] মাইনরিটি রাইটস গ্রুপ। "শ্রীলংকা। ওয়ার্ল্ড ডিরেকটরি অফ মাইনরিটিস & ইন্ডিজেনাস পিপলস।" মে ১৫, ২০২১ এ দেখা হয়েছে।
https://minorityrights.org/country/sri-lanka/.

[51] হার্ভার্ড ইন্টারন্যাশনাল রিভিউ। " দ্য শ্রীলংকান সিভিল ওয়ার অ্যান্ড ইটস হিস্টরি," আগস্ট ৩১, ২০২০ এ পুনরায় দেখা হয়েছে।
https://hir.harvard.edu/sri-lankan-civil-war/.

[52] ইউনাইটেড স্টেটস ডিপার্টমেন্ট অফ স্টেট। "শ্রীলংকা।" মে ১৫, ২০২১ এ দেখা হয়েছে।
https://www.state.gov/reports/country-reports-on-terrorism-2019/sri-lanka/.

[53] হার্ভার্ড ইন্টারন্যাশনাল রিভিউ। " দ্য শ্রীলংকান সিভিল ওয়ার অ্যান্ড ইটস হিস্টরি," আগস্ট ৩১, ২০২০ এ পুনরায় দেখা হয়েছে।
https://hir.harvard.edu/sri-lankan-civil-war/.

[54] মাইনরিটি রাইটস গ্রুপ। "শ্রীলংকা। ওয়ার্ল্ড ডিরেকটরি অফ মাইনরিটিস & ইন্ডিজেনাস পিপলস।" মে ১৫, ২০২১ এ দেখা হয়েছে।
https://minorityrights.org/country/sri-lanka/.

[55] পূর্বোক্ত

[56] "আ স্কলার অফ এক্সট্রিমিজম অন হাউ রিলিজিয়াস কনফ্লিক্ট শেপস শ্রীলংকা। দ্য নিউ ইয়র্কার।" জুন ১৬, ২০২১ এ দেখা হয়েছে।
https://www.newyorker.com/news/q-and-a/a-scholar-of-extremism-on-how-religious-conflict-and-terrorism-shapes-sri-lanka.

[57] ইউনাইটেড স্টেটস ডিপার্টমেন্ট অফ স্টেট। "শ্রীলংকা।" মে ১৫, ২০২১ এ দেখা হয়েছে। https://www.state.gov/reports/country-reports-on-terrorism-2019/sri-lanka/.

[58] হানিফা, ফারজানা। "হোয়াট ইজ বিহাইন্ড দ্য অ্যান্টি-মুসলিম মেজারস ইন শ্রীলংকা?" মে ১৬, ২০২১ এ দেখা হয়েছে।
https://www.aljazeera.com/opinions/2021/4/12/what-is-behind-the-anti-muslim-measures-in-sri-lanka

প্রতিনিধিগণ প্রকাশ্যেই বোরখা নিষিদ্ধের কথা বলেছেন এবং ১০০০ এর বেশি ইসলামিক স্কুল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। [59] ২০২১ সালের মার্চে সরকার আরও ঘোষণা দেয় যে আমদানি করা সকল ইসলামি বই প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাবে। [60] ১৯৭৯ সালের দ্য প্রিভেনশন অফ টেররিজম অ্যাক্ট নতুন করে আবার প্রয়োগ করা শুরু হয়েছে সন্দেহভাজনদের দুই বছর পর্যন্ত "অ-মৌলবাদীকরণ সেন্টারে" শাস্তি দেওয়ার জন্য। [61] COVID-19 মহামারির সময় সরকার মহামারিতে নিহতদের জন্য বাধ্যতামূলক শবদাহ এর নির্দেশনা দেয় এবং মুসলিম ও খ্রিস্টানদের তাদের ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী মৃতদেহ কবর দেওয়ার অধিকারকে অগ্রাহ্য করে। [62] বাধ্যতামূলক শবদাহ নিয়ে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক মহলের সমালোচনার মুখে সরকার সম্প্রতি জনবিচ্ছিন্ন একটি দ্বীপে মুসলিম ও খ্রিস্টান জনগোষ্ঠী থেকে COVID-19 মৃতদের কবর দেওয়ার ব্যাবস্থা নিয়েছে। স্থানীয় সংখ্যালঘু নেতারা অবশ্য এই সিদ্ধান্তকে "পুরোপুরি বর্ণবাদী" বলে আখ্যা দিয়েছেন এবং সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা বৃদ্ধি করে ওই অঞ্চলে বসবাসরত তামিলদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেওয়ার জন্য সরকারের একটি কূটচাল বলে মনে করছেন। [63]

থাইল্যান্ডঃ

থাইল্যান্ডেও কিছু সমস্যা দেখা যায় জাতীয় পরিচয়ের ক্ষেত্রে বৌদ্ধ সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর ভূমিকা এবং সেইসাথে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সম্পর্ক নিয়ে। এই সমস্যাগুলো অভিবাসনের ধরণ, সীমান্ত সংঘাত, এবং নাগরিক সামাজিক পরিসরে আরোপিত বিধি নিষেধের সাথে যুক্ত। থাইল্যান্ডের ২০১০ সালের আদমশুমারি এবং সাম্প্রতিক রিপোর্ট অনুযায়ী দেখা যায় যে জনসংখ্যার ৯৩-৯৫% হল থেরাভেদা বৌদ্ধ, এবং প্রায় ৫% হচ্ছে সুন্নি মুসলমান। অন্যান্য ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের মধ্যে আছে প্রকৃতিবাদী, খ্রিস্টান, হিন্দু, ইহুদি, এবং শিখ। তথাকথিত "গহীন দক্ষিণ" প্রদেশ গুলোতে যথা নারাথিয়াত, ইয়ালা, এবং পাত্তানি প্রদেশে ইসলাম হচ্ছে প্রভাববিস্তারী ধর্ম।

থাই সংবিধানে সকল ব্যক্তিকে তার ইচ্ছানুযায়ী ধর্মবিশ্বাস গ্রহণ, ধর্ম পালন, এবং প্রকশের অধিকার দেওয়া হয়েছে যদি না তা নিরাপত্তা ও রাষ্ট্রের জন্য ক্ষতিকর হয়। [64] বৌদ্ধ ধর্মের যেকোনো রকম অবমাননা প্রতিরোধ করতে ২০১৭ সালের সংবিধানে থেরাভাদা বৌদ্ধ ধর্মের জন্য বিশেষ বাবস্থা রাখা হয় এবং সামাজিক বা রাজনৈতিক হাতিয়ার যেমন শিক্ষার বাধ্যমে এই ধর্মের উন্নয়ন ও প্রসারের কথা বলা হয়। সংবিধানের ৩১ নং অনুচ্ছেদ অবশ্য ধর্মীয় স্বাধীনতার বিধানকে এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে বলে যে, যেকোন ধর্ম মানার অনুমতি আছে যদি সেটা থাই জনগোষ্ঠীর কর্তব্য পালনে ক্ষতি না করে, যদি রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য ক্ষতিকর না হয়, অথবা জনগণের নৈতিকতার বিরুদ্ধে না যায়। [65] যেহেতু এই শর্তগুলোর নানা ব্যাখ্যা করা যায়, তাই ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ধর্মপালনকে খুব সহজেই লক্ষ্যবস্তু করা যায়। থাইল্যান্ডের দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্ম হিসেবে ইসলাম সমাজ ও রাষ্ট্রের কাছ থেকে বিশেষ নজর পায়। ১৯৪৬ সালের আইন অনুযায়ী থাইল্যান্ড এর দক্ষিণের মুসলিম অধ্যুষিত প্রদেশগুলিতে মুসলিমদের জন্য শরিয়া আইন প্রয়োগের অনুমতি দেয়। তবে শরিয়া আইনের প্রয়োগ পারিবারিক সমস্যা ও আদালতে উত্তরাধিকার জনিত সমস্যা মেটানোর ব্যাপারেই সীমাবদ্ধ।[66]

থাইল্যান্ডের দক্ষিণে অনেকদিন ধরে চলা বিক্ষোভ আসলে ধর্ম ও জাতিসত্ত্বার সাথে পারস্পরিকভাবে জড়িত এবং এই বিক্ষোভ ওই এলাকার বৌদ্ধ ও মুসলিমদের মধ্যে মারাত্মক দ্বন্দের জন্ম দিয়েছে। এই দ্বন্দ্ব সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি আছে এবং তেমন কিছু

---

[59] পূর্বোক্ত

[60] পূর্বোক্ত

[61] "শ্রীলংকা টু পারসিউ 'ডি-র‍্যাডিকালাইজেশন' ডিটেনশন, আউট ল বুরখা।" মে ১৬, ২০২১ এ দেখা হয়েছে।
https://www.thenews.com.pk/latest/803747-sri-lanka-bans-burqa-in-de-radicalistion-bid.

[62] "কোভিড-১৯ঃ শ্রীলংকা রিজারভস 'অ্যান্টি-মুসলিম" ক্রিমেশন অর্ডার।" বিবিসি নিউজ, ফেব্রুয়ারি ২৬, ২০২১, সেকশন, এশিয়া।
https://www.bbc.com/news/world-asia-56205737.

[63] "কোভিড-১৯: শ্রীলংকা চুজেস রিমোট আইল্যান্ড ফর বারিয়ালস।" বিবিসি নিউজ, মার্চ ২, ২০২১, সেকশন এশিয়া।
https://www.bbc.com/news/world-asia-56249805.

[64] মাইনরিটি রাইটস গ্রুপ। "থাইল্যান্ড । ওয়ার্ল্ড ডিরেকটরি অফ মাইনরিটিস & ইন্ডিজেনাস পিপলস।" মে ১৬, ২০২১ এ দেখা হয়েছে।
https://minorityrights.org/country/thailand/.

[65] পূর্বোক্ত

[66] ইমাইযুমি, শিন্যা। "দ্য অ্যাপলিকেশন অফ ইসলামিক ল ইন থাইল্যান্ড," ২০১৭। ৩১। https://core.ac.uk/download/pdf/288467807.pdf

আলামত পাওয়াও যাচ্ছে। বিশেষত মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলোয় এই সংঘাত দীর্ঘদিনব্যাপী, জটিল, এবং এখনও পর্যন্ত অনিবার্য। [67] ক্ষমতা ভাগাভাগি এবং ভাষাগত ও জাতিগত পরিচয়ের অধিকার নিয়ে থাই সরকার ও মালয় মুসলিমদের মধ্যে অনেক বছর ধরেই দরকষাকষি হচ্ছে কোনও পরিষ্কার ফলাফল ছাড়াই। এই সংঘাতে ২০০৪-২০২১ সালের মধ্যে ৭২৩৩ জন প্রাণ হারিয়েছেন। [68] যদিও কোনও কোনও বিশ্লেষক মুসলিমদের সাথে থাই সরকারের এই সমস্যাকে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ সমস্যার সাথে মিলিয়ে দেখতে চান, কিন্তু এমন যথেষ্ট প্রমাণ আছে যেই সংঘাত স্থানীয় সমস্যা ফলে তৈরি হয়েছে। [69] দুটি প্রধান সমস্যা হচ্ছে দারিদ্র্য এবং দক্ষিণের প্রদেশগুলোর কাজকর্মে স্থানীয় মানুষের প্রতিনিধিত্ব কম থাকা। এই অঞ্চলে মালয় মুসলিমদের ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলেও বেশীরভাগ সরকারি চাকরি এবং পাবলিক স্কুলের শিক্ষকের পদে আছে অ-মালয় মুসলিমেরা। সরকারি স্কুলে শিক্ষাদানের ভাষা হিসেবে শুধু থাই ভাষা ব্যাবহার করা হয়, যদিও জনগণ মালয় ভাষায় পাঠদানের দাবি জানিয়ে আসছে। এটাকে সরকারের আত্তীকরণ প্রচেষ্টার অংশ হিসবে একটি কূটচাল হিসেবে দেখা হয়।

থাইল্যান্ড তার রাষ্ট্রীয় আইন ও নীতিমালার সাথে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার নীতির সমন্বয় করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তবে ধর্ম বা বিশ্বাসের স্বাধীনতার ব্যাপারে অনেক বিষয়য়েই অস্পষ্টতা রয়ে গেছে। ২০১৭ সালের সংবিধানে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে যে নারী ও পুরুষ সমান অধিকার ভোগ করবে। [70] তবে ধর্মীয় বিধান সমূহের ব্যাপারে এটিকে উহ্য রাখা হয়েছে। [71] ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে নারী ও পুরুষের ভূমিকায় উল্লেখযোগ্য অসমতা রয়েছে।

রাষ্ট্রীয় আইন মহিলা ভিক্ষুদের আইনগত স্বীকৃতি দেয় না, তাই মহিলা ভিক্ষুদের স্বীকৃতির জন্য শ্রীলংকায় ভ্রমণ করতে হয়। বিদ্যমান তথ্য উপাত্ত দ্বারা পাওয়া যায় যে ২৩৯০২৩ জন ধর্মগুরুর মধ্যে আনুমানিক .১% হচ্ছে নারী। [72] যদিও নারী ভিক্ষুদের বৌদ্ধ মঠ এবং মন্দির প্রতিষ্ঠা ও ধর্মাচার পালনের অনুমতি আছে, সেসব প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি পায় না এবং সরকারের তরফ থেকে কোনও ভর্তুকি বা অন্যান্য সুবিধা যেমন করমুক্তি পায় না। অন্যান্য ধর্ম গোষ্ঠীর মধ্যেও নারী নেতৃত্ব প্রায় নেই বললেই চলে।

ইন্দোনেশিয়াঃ

সামাজিক সংহতি, নিরাপত্তা, ও জাতীয় পরিচয়ের বোধগম্যতার ক্ষেত্রে সমসাময়িক ইন্দোনেশিয়ায় ধর্মীয় পরিচয় ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জ উপস্থাপন ধরে। ধর্মীয় ভিন্নতার প্রতি সহিষ্ণুতা ইন্দোনেশিয়ার রাজনৈতিক ও সামাজিক পটভূমিতে একটি মৌলিক অংশ। আর যে নীতিমালার মাধ্যমে তা গড়ে উঠেছে সেই ‘‘প্যানকাসিলা’’ হচ্ছে ইন্দোনেশিয়ান জাতীয়তার নীল নকশা। ১৯৪৫ সালে প্রকাশ করা ইন্দোনেশিয়ার সংবিধানে পাঁচটি মূলনীতির কথা বলা হয়েছে। যথাঃ একেশ্বরবাদ, সভ্য ও যথাযথ মানবিকতা, ইন্দোনেশিয়ার ঐক্য, বিচক্ষণ দিকনির্দেশনার অধীনে প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র, এবং ইন্দোনেশিয়ার সকল জনগণের জন্য সামাজিক সুবিচার। বিশ্বের সর্ববৃহৎ মুসলিম জনগোষ্ঠী নিয়ে ইন্দোনেশিয়ার ধর্মীয় বহুত্ববাদের প্রসারে সুচিন্তিত নীতিমালা গ্রহণের সুদীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে যা কিনা প্যানকাসিলা মতবাদের মাধ্যমে প্রকাশিত।

---

[67] জোল, ক্রিস্টোফার মার্ক। “কনটেক্সটুলাইযিং ডিস্ক্রিমিনেশন অফ রিলিজিয়াস অ্যান্ড লিঙ্গুস্টিক মাইনরিটিস ইন সাউথ থাইল্যান্ড।” মুসলিম ওয়ার্ল্ড জার্নাল অফ হিউম্যান রাইটস, এপ্রিল ১, ২০২১। https://doi.org/10.1515/mwjhr-2020-0025.

[68] “সামারই অফ ইনসিডেন্টস ইন সাউদার্ন থাইল্যান্ড, মার্চ ২০২১ । DeepSouthWatch.Org.” মে ১৬, ২০২১ এ দেখা হয়েছে। https://deepsouthwatch.org/en/node/11981.

[69] ক্রাইসিস গ্রুপ। “সাউদার্ন থাইল্যান্ডঃ ইনসার্জেন্সি, নট জিহাদ,” মে ১৮, ২০০৫ https://www.crisisgroup.org/asia/south-east-asia/thailand/southern-thailand-insurgency-not-jihad.

[70] ইউএন উইমেন । এশিয়া অ্যান্ড দ্য প্যাসিফিক। “থাইল্যান্ড কান্ট্রি পেইজ – ইউএন উইমেন এশিয়া প্যসিফিক।” মে ১৬, ২০২১ এ দেখা হয়েছে। https://asiapacific.unwomen.org/en/countries/thailand.

[71] ইউনাইটেড স্টেটস ডিপার্টমেন্ট অফ স্টেট। “থাইল্যান্ড” মে ১৬, ২০২১ এ দেখা হয়েছে। https://www.state.gov/reports/2020-report-on-international-religious-freedom/thailand/.

[72] পূর্বোক্ত

ইন্দোনেশিয়ার ২৬৭ মিলিয়ন জনসংখ্যার প্রায় ৮৭% সুন্নি ইসলামের অনুসারী, ৭% প্রটেস্টান্ট খ্রিস্টান, ৩% ক্যাথলিক খ্রিস্টান, ১.৫% হিন্দু, ০.৭% বৌদ্ধ, এবং ০.৮% আদিবাসী ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বী।[73] ইন্দোনেশিয়ার সংবিধান শর্তসাপেক্ষে ধর্মীয় স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দেয়। এটি ধর্মীয় স্বাধীনতাকে মানবাধিকার হিসেবে সমুন্নত রাখে এবং ইচ্ছানুযায়ী একজনের ধর্মপালনের অধিকারের নিশ্চয়তা দেয়। [74] উপাসনার অধিকার সুরক্ষিত তবে তা যেন কখনই নৈতিক মূল্যায়ন, ধর্মীয় মূল্যবোধ, নিরাপত্তা, লঙ্ঘন না করে এবং একটি গণতান্ত্রিক সমাজে শৃঙ্খলা ভঙ্গ না করে।[75]

ইন্দোনেশিয়ার সাংবিধানিক ও আইনগত দিকের একটি স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য হল তা কেবলমাত্র ছয়টি ধর্মকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেয়ঃ ইসলাম, ক্যাথলিকইজম, প্রটেস্টানিজম, বৌদ্ধ, হিন্দু, এবং কনফুসিয়ানিজম। স্বীকৃত প্রতিটি ধর্মেরই একজন প্রবর্তক, পবিত্র বই, একজন উপাস্য, এবং আন্তর্জাতিক পরিচিতি থাকতে হবে। তাই এই বিধান লোকায়ত ও আদিবাসী ধর্মগুলোর প্রতি বৈষম্য স্থাপন করে।[76]

ধর্মীয় উগ্রবাদের প্রতি ইন্দোনেশিয়ার দৃষ্টিপাত এর ধর্মীয় স্বাধীনতা ও শান্তিপ্রতিষ্ঠার রূপরেখার সাথে যুক্ত। ফৌজদারি আইন (১৫৬/এ) ১৯৬৫ এর প্রেসিডেন্সিয়াল ডিক্রি দ্বারা রাষ্ট্রকর্তৃক স্বীকৃত ধর্মসমূহের জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যেকোনো শত্রুভাবাপন্ন, ঘৃণাযুক্ত, ও অবজ্ঞামিশ্রিত আচরণ এবং ধর্মের অপব্যাখ্যাকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। [77] ইন্দোনেশিয়ার পার্লামেন্ট এই আইনের পরিধি আরও বাড়ানোর চিন্তা করছে এবং আরও কিছু ব্যাপারকে শাস্তির আওতায় নিয়ে আসার কথা ভাবছে যেমন, কোনও ধর্মের অসম্মান করা, কাউকে অবিশ্বাসী হতে প্রলুব্ধ করা, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে বিঘ্ন ঘটানো বা উপাসনালয়ের কাছে গোলমাল করা, এবং ধর্মগুরুকে অসম্মান করা যখন সে ধর্মাচার করছে। [78] ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর আশংকা এই আইনগুলো তাদের বিরুদ্ধে ব্যাবহার করা হতে পারে। এর সাথে, ২০০৮ সালের ইন্দোনেশিয়ার ইলেক্ট্রনিক ইনফরমেশন অ্যান্ড ট্রান্সাকশন ল সকল ধরনের ব্লাস্ফেমাস উপাদান অনলাইনে ছড়ানো নিষিদ্ধ করে। ১৯৬৫ সাল থেকে ১৫০ জনেরও বেশী মানুষকে এই ব্লাস্ফেমাস আইনের আওতায় সাজা দেওয়া হয়েছে, এবং তাদের বেশীরভাগই ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর এবং সেইসব মানুষ যারা "ইসলামের সমালোচনা করেছে।" [79]

অপ্রধান ধর্ম পালনের কারণে অত্যাচারের সুদীর্ঘ ইতিহাস আছে ইন্দোনেশিয়ার। সাম্প্রতিক বছরগুলোতেও এমন কিছু ঘটনা আছে। আহামদিয়া সম্প্রদায়কে লক্ষ্যবস্তু করা হচ্ছে সেই ২০০৮ সাল থেকেই যখন এই ডিক্রি বলে তাদেরকে প্রথাবিরোধী আখ্যা দেওয়া হয় এবং তাদের ধর্মে কাউকে দীক্ষিত করাকে নিষিদ্ধ করা হয়। প্রায় একই ধরণের নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছিল ফজর নুসানতারা আন্দোলনের সময় যা গাফাতার নামে পরিচিত। [80] মজলিশ উলামা ইন্দোনেশিয়া (MUI) ফতোয়ার দিয়ে বেশ কিছু ধর্মীয় গোষ্ঠীর ধর্ম প্রচার নিষিদ্ধ করেছে যেমনঃ ইস্কার-আল-সুন্নাহ, আহমদিয়া, ইসলাম জামায়াহ, দ্য লিয়া ইডেন কমিউনিটি, এবং আল-কায়দা আল- ইসলামিয়াহ [81]শিয়া সম্প্রদায়ও এমন ফতোয়ার সম্মুখীন হয়েছে যেখানে তাদের শিয়া শিক্ষা নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। এই নিষেধাজ্ঞাগুলোর ব্যাপারে জনগণের মিশ্র প্রতিক্রিয়া রয়েছে। সুশীল সমাজে যদিও সবার জন্য সমান সুবিচার করার আহবান জানানো হয়, স্থানীয় সরকার এবং কিছু সুন্নি নেতা আহমদিয়া সম্প্রদায়ের উপর ক্রমাগত চাপ প্রয়োগ করে যেতে থাকে হয় ধর্মান্তরিত হতে

[73] ইউনাইটেড স্টেটস ডিপার্টমেন্ট অফ স্টেট। "ইন্দোনেশিয়া" মে ১৭, ২০২১ এ দেখা হয়েছে। https://www.state.gov/reports/2020-report-on-international-religious-freedom/indonesia/.

[74] পূর্বোক্ত

[75] পূর্বোক্ত

[76] পূর্বোক্ত

[77] নারদি, ডোমিনিক জে, এবং প্যাট্রিক গ্রিনওয়াল্ট। "পলিসি আপডেটঃ ব্লাস্ফেমি অ্যালেগেশন ইন আ পোলারাইজড ইন্দোনেশিয়া," ২০১৯, ৫।

[78] হিউম্যান রাইটস ওয়াচ। "ইন্দোনেশিয়া টু এক্সপ্যান্ড অ্যাবিউসিভ ব্লাস্ফেমি ল," অক্টোবর ৩১, ২০১৯। https://www.hrw.org/news/2019/10/31/indonesia-expand-abusive-blasphemy-law.

[79] পূর্বোক্ত

[80] ইউনাইটেড স্টেটস ডিপার্টমেন্ট অফ স্টেট। "ইন্দোনেশিয়া" মে ১৭, ২০২১ এ দেখা হয়েছে। https://www.state.gov/reports/2020-report-on-international-religious-freedom/indonesia/.

[81] পূর্বোক্ত

অথবা অন্যত্র সরে যেতে। [82] ইন্দোনেশিয়ার বর্তমান ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রী সম্প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অধিকার সংরক্ষণের জন্য। [83]

উত্তর সুমাত্রার আচেহ প্রদেশ ইন্দোনেশিয়ার সবচেয়ে ধর্মীয় রক্ষণশীল জায়গা। এখানে শরিয়া আইন চালু আছে। শরিয়া আইন ঐতিহ্যগতভাবে বিয়ে, বিবাহ বিচ্ছেদ, উত্তারিধিকারের মত ব্যাপারগুলো দেখলেও, ইদানীং এই আইনের আওতা আরও বৃদ্ধি পেয়ে সমকামিতা, বিবাহপূর্ব বা বহির্ভূত যৌনাচার, জুয়া, মদপান এর মত বিষয়েও বিচার শুরু করেছে। [84] নৈতিক পুলিশিং, প্রকাশ্যে অপমান, বেত্রাঘাত, এবং নারীর চলাফেরায় বিধিনিষেধ আরোপ আচেহ এর শরিয়া আইনে মানবাধিকার লঙ্ঘনের কিছু নমুনামাত্র।

যেসব বিষয়ে বিশেষভাবে নজর দেওয়া ও প্রচার চালানো দরকার

ধর্ম বা বিশ্বাসের স্বাধীনতা প্রসারের মাধ্যমে শান্তিপ্রতিষ্ঠার জন্য সক্রিয় এবং সু-কাঠামোবদ্ধ সংলাপ ও এবং গবেষণা ও নিরীক্ষার মাধ্যমে ধর্মীয় আচার সম্পর্কে জ্ঞান বৃদ্ধি ও অনুধাবনের জন্য নিয়মতান্ত্রিক প্রচেষ্টা প্রয়োজন। একটি সামগ্রিক লক্ষ্য হল জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে বহুত্ববাদ ও সবাইকে নিয়ে সমাজ গড়ার সুবিধাগুলো অনুধাবন ও লিপিবদ্ধ করা। অঞ্চলসমূহের সমৃদ্ধ আন্তধর্মীয় পারস্পরিক ক্রিয়া এবং ভবিষ্যৎ বিনির্মানে কৌশলগত রূপরেখা তৈরি করা যেতে পারে ঐতিহ্যবাহী এবং আধুনিক দুই ধরণের বর্ননার মাধ্যমেই যা গোষ্ঠীসমূহের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া ও সৌহার্দ্য রক্ষায় সমর্থন যোগায়।

গবেষণা ও SEA-AIR প্রকল্পের মাধ্যমে পাওয়া অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে নীচের সুপারিশ বা প্রস্তাবনা গুলো উল্লেখ করা যায়ঃ

বৈষম্য নিরসনে আন্তর্জাতিক আইনকাঠামো প্রয়োগ ও সমুন্নত রাখাঃ আইন সংশোধনের জন্য রাষ্ট্রীয় ও অ-রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে নিয়মিত ও সমন্বিত প্রচেষ্টা চালানো দরকার। ধর্ম বা বিশ্বাসের স্বাধীনতা রক্ষায় আন্তর্জাতিক সুরক্ষাগুলো গড়ে তোলা এবং জাতীয় পর্যায়ে সাংবিধানিকভাবে এই সুরক্ষা নিশ্চিত করার মাধ্যমে জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে ঐক্য গঠন করা প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে ধরা যেতে পারে। আঞ্চলিক প্ল্যাটফর্মগুলো (যেমন ASEAN পার্লামেন্টারিয়ানস ফর হিউম্যান রাইটস (APHR) এবং SAARC) রাষ্ট্রের আইনসংস্থাগুলোকে এক করতে পারে জাতীয় আইন, মামলা প্রক্রিয়া, নীতিমালা, ও তার প্রণয়নের জায়গাগুলোতে বৈষম্যের জায়গাগুলো পরীক্ষা করার জন্য। বিশেষ বিশেষ বিষয় তাদের নেতিবাচক প্রভাব যুক্ত করতে পারে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপর।

ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাঃ দেশগুলোর সরকারের বিচারিক ও কার্যকরী শাখাগুলো কর্তৃক স্থানীয় প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রতি সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা দেওয়া হলে তা বিভিন্ন সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর জীবন, সম্পদ, উপাসনাস্থল, এবং গুরুত্বপূর্ন স্থাপনার নিরাপত্তা বাড়িয়ে তুলবে। COVID-19 সম্পর্কিত বিধি নিষেধ থাকা সত্ত্বেও মানুষকে তাদের ধর্মবিশ্বাস সবখানে শান্তিমত পালন করতে দেওয়া উচিৎ। সামাজিক ঐক্য এবং পারস্পরিক সম্মানের বিষয়ে সক্রিয় প্রসার দরকার যেমন যেমন ভিন্ন ভিন্ন ধর্মবিশ্বাসীদের মধ্যে বা একই বিশ্বাসের মানুষদের মধ্যে সংলাপের আয়োজন করা যেতে পারে। এর মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক সহিংসতা প্রতিরোধ করে শান্তির বিস্তার করা সম্ভব। ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জন্য আইনি সুরক্ষার ক্ষেত্রে ধর্মীয় পবিত্র স্থানসমূহের নিরাপত্তা বিধানের উল্লেখ থাকা উচিৎ নির্দিষ্ট করে। [85]

---

[82] মাইনরিটি রাইটস গ্রুপ। "ইন্দোনেশিয়া । ওয়ার্ল্ড ডিরেকটরি অফ মাইনরিটিস & ইন্ডিজেনাস পিপলস।" মে ১৭, ২০২১ এ দেখা হয়েছে।
https://minorityrights.org/country/indonesia/.

[83] স্রাঞ্জিও, সেবাস্টিয়ান। "ইন্দোনেশিয়ান মিনিস্টার প্লেডজস টু সেফগার্ড রিলিজিয়াস মাইনরিটিস।" মে ১৭, ২০২১ এ দেখা হয়েছে।
https://thediplomat.com/2021/01/indonesian-minister-pledges-to-safeguard-religious-minorities/.

[84] লেওয়েলিন, আইশাহ। "'শেম অ্যান্ড হিউমিলেশন'ঃ আচেহ'স ইসলামিক ল ভায়োলেটস হিউম্যান রাইটস।" মে ১৭, ২০২১ এ দেখা হয়েছে।
https://www.aljazeera.com/news/2019/6/28/shame-and-humiliation-acehs-islamic-law-violates-human-rights.

[85] UN Alliance of Civilization's Plan of Action to Safeguard Religious Sites এর বেশ কিছু নির্দেশিকা আছে যে কীভাবে বিভিন্ন পক্ষকে যুক্ত করা যায় জনগোষ্ঠী ও তাদের পবিত্র জায়গাকে রক্ষার ব্যাপারে যা কিনা রাষ্ট্র ও নাগরিক সমাজ মেনে চলতে পারে। এই নির্দেশিকাগুলো এখানে পাওয়া যাবেঃ
https://www.un.org/sg/sites/www.un.org.sg/files/atoms/files/12-09-2019-UNAOC-PoA-Religious-Sites.pdf

অবমাননার শিকার হওয়া মানুষদের সুবিচার নিশ্চিত করাঃ সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে দায়ভার এড়িয়ে যাওয়ার একটা প্রবণতা রয়েছে যা দুশ্চিন্তার একটি কেন্দ্রবিন্দু। সরকার এবং এর সহযোগী অঙ্গসংগঠনগুলোর কাজ করা উচিৎ যাতে অবমাননার শিকার হওয়া মানুষেরা আইনি ও সামাজিক উভয় ক্ষেত্রেই সাহায্য পায়।

সংখ্যালঘুদের ন্যায়সঙ্গত প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করাঃ ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সংখ্যা প্রায় সময়ই সরকারি চাকরি, আইনসভা, এবং নিরাপত্তাবাহিনীতে অসম অনুপাতে বিন্যস্ত হয়। এই ভারসাম্যের অভাব ঠিক করতে ইতিবাচক পদক্ষেপ দরকার। সরকারের উচিৎ শিক্ষাক্ষেত্রে বিদ্যমান বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা ঢেলে সাজানো যার মধ্যে নিয়োগপ্রক্রিয়াও অন্তর্ভুক্ত।

সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষার সমান সুযোগ নিশ্চিত করাঃ সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থা প্রায়ই সরাসরি ও পরোক্ষভাবে আত্তীকরণ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে একটি হাতিয়াররূপে ব্যবহৃত হয়। শিক্ষা সামাজিক ঐক্য বৃদ্ধি করবে এই নীতির ব্যাপারে জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে রাষ্ট্র ও ধর্মীয় নেতাদের সম্মতিজ্ঞাপন করা উচিৎ। জাতীয় শিক্ষাক্রম থেকে ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী সম্পর্কে ভ্রান্ত ও অসম্মানজনক ধারণার বিষয়গুলো দূর করতে শিক্ষাক্রমের সংশোধন প্রয়োজন। এছাড়া ধর্ম পড়ানো উচিৎ তুলনামূলকভাবে এবং কোনও ধর্ম বা বিশ্বাসের প্রতি অসম্মান না রেখে। ধর্ম যদি জাতীয় শিক্ষাক্রমের অংশ হিসেবে স্কুলে পড়ানো হয় তাহলে ধর্ম শিক্ষকদের অবশ্যই প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে যাওয়া উচিৎ যাতে করে তারা ধর্মশিক্ষা দিতে স্বাচ্ছন্দ্য হয়। যেখানে প্রযোজ্য সেখানে একাধিক ভাষায় শিক্ষাদানের প্রণয়ন করা উচিৎ।

সংখ্যালঘু নারী ও শিশুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাঃ সাম্প্রদায়িক সহিংসতার সবচেয়ে বড় শিকার হন নারী ও শিশুরা, যেমন ধর্ষণ। সংখ্যালঘু নারী ও শিশুদের প্রতি সংঘটিত লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধে সরকারের উচিৎ সক্রিয় কর্মপদ্ধতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।

“দক্ষিণপূর্ব এশিয়াঃ আন্তধর্মীয় সংলাপ এবং ধর্ম অথবা বিশ্বাসের স্বাধীনতা (এসইএ-এআইআর)” প্রকল্পটি ইউরোপীয়ান ইউনিউনের অর্থায়নে এবং দ্য নেটওয়ার্ক ফর রিলিজিয়াস অ্যান্ড ট্র্যাডিশনাল পীসমেকারস, ফিন চার্চ এইড, সাথিরাকোসেস নাগাপ্রদীপা ফাউন্ডেশন, ইসলামিক রিলিফ ওয়ার্ল্ডওয়াইড, ওয়ার্ল্ড কনফারেন্স অফ রিলিজয়নস ফর পীস, এবং ওয়ার্ল্ড ফেইথস ডেভেলপমেন্ট ডায়ালগ এর সমন্বয়ে বাস্তবায়িত হয়েছে।

এ প্রকল্প সম্পর্কে যেকোন তথ্যের জন্যে যোগাযোগ করুন প্রকল্প ব্যবস্থাপক এর ইমেইল ঠিকানায়ঃ

philip.gassert@kua.fi